

মানব সভ্যতার কাহিনী

পশ্চিম দিনাজপুর
জেলা শিক্ষক সমিতি
(এ.বি.টি.এ)

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI. Vide/H/79/12, dated 5.12.79.

মানব সভ্যতার কাহিনী

[প্রাচীন যুগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণী)

ফোনঃ ৩১-২২৩৭

বুক সেন্টার
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮বি/১, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবিহঙ্গ ভূষণ কুণ্ডু
৮বি/১, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮২
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৮৪

মূল্য : ৯·৪০ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় | অতীত কথা

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ঃ প্রচলিত অর্থে ইতিহাস কথাটির অর্থ হল অতীত কথা বা অতীতের কাহিনী। সব কিছুরই, অতীত আছে, সেজন্য তার ইতিহাসও আছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পৃথিবীতে আমরা কত বন-জঙ্গল দেখি—সেগুলি চিরকাল একই রকম ছিল না। ইতিহাস কিন্তু বন-জঙ্গলের অতীত কথা নিয়ে ভাবে না। কারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হল মানুষ। আদিম মানুষেরা কেমন করে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে পৃথিবীতে বসবাস শুরু করল, চাষ-আবাদ শিখল, সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে লাগল, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে নানাপ্রকার ধাতুর আবিষ্কার করল, ধীরে ধীরে সভ্যতা গড়ে তুলল—এসব কিছুই ইতিহাসের আলোচনার মধ্যে পড়ে। যুগ-যুগান্তরব্যাপী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারাকে কিভাবে উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলেছে, সেটাই জানায় ইতিহাস। অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমান জীবনধারাকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলার পথ নির্দেশ করে ইতিহাস। এসব কারণেই আমরা ইতিহাস পড়ে থাকি।

ইতিহাস কোন বিশেষ রাজ-রাজড়ার যুদ্ধজয়ের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেনি। সমগ্র মানবসমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের কাহিনীই আমাদের কাছে তুলে ধরে। সে কারণেই ইতিহাস পড়ে আমরা যেমন অনেক অজানা তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হই, সেই সঙ্গে সমগ্র মানব-সমাজের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক উপলব্ধি করি।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার উপায় ঃ যারা মানবসমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আমাদের কাছে তুলে ধরেন,

সে-সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের বলা হয় ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকেরা হাজার হাজার বছরের মানবসমাজের ইতিহাস জানার সুবিধার জন্য তিনটি যুগ বিভাগ করেছেন। সেগুলো হোল—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের কিছু কিছু লিখিত উপাদান পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রাচীন যুগ সম্পর্কে তেমন কিছু লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার জন্য ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন উপকরণের ওপর নির্ভর করে থাকেন। এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হলেও অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোন ঘটনার কাল-সীমা নির্দেশ করতে হয়।

প্রথমতঃ, একদল পণ্ডিত ব্যক্তি মাটির তলায় খননকার্য চালিয়ে লুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাচীন যুগের মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু, চীনা সভ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক অজানা ও বিলুপ্তপ্রায় তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের এবং বিদেশের প্রাচীন যুগের কথা পাথরের গায়ে লেখা পাওয়া যায়। তাকে বলে শিলালিপি। মহারাজ অশোক পাহাড়ের গায়ে অনেক শিলালিপি লিখিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে লেখার জন্য নানারকম জিনিস ব্যবহার করা হত। যেমন, মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনে মাটির টালির ওপর লেখা হত। আবার মিশরে লেখা হত প্যাপিরাস নামে লম্বা ঘাসের পাতায়। আমাদের দেশে তালপাতা ও ভূর্জপত্রে (এক রকম গাছের ছালে) পুঁথি লেখা হত। তা ছাড়া তামার পাতে লেখা দিগ্বিজয়ের কাহিনী কিংবা দানপত্র প্রভৃতিও প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। তাকে বলে তাম্রশাসন।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীন কালের বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন দেশের প্রাচীন কাব্য, সাহিত্য এবং কিংবদন্তী থেকে আমরা প্রাচীন যুগের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

চতুর্থতঃ, প্রাচীন যুগের রাজাদের সময়কার সোনা, রূপা বা

তামার মুদ্রা থেকে বিভিন্ন রাজ-রাজড়ার সম্বন্ধে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। আমাদের দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি পাওয়া গেছে। সেটা থেকে তাঁর সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় মেলে।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের ভাষা ও লিপি এখন প্রচলিত নেই। মেসোপটেমিয়াতে প্রচলিত কিউনিফর্ম লিপি ও মিশরে প্রচলিত হায়রোগ্লিফিক লিপি, পাঠোদ্ধারে দ্বারা আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ষষ্ঠতঃ, নৃতাত্ত্বিক নামে একদল পণ্ডিত ব্যক্তি অতি প্রাচীনযুগের মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, হাড়গোড়, ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রভৃতি দেখে, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের দেহগঠন, চেহারার বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কে নানা অজানা রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন।

সপ্তমতঃ, প্রাচীন যুগের সৌধ, মঠ, মন্দির, বৌদ্ধস্তূপ পাওয়া গেছে। এছাড়া আলতামিরা গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্র, আমাদের দেশের অজন্তা ও ইলোরায় গুহায় আঁকা বহু রঙিন চিত্র পাওয়া গেছে। এগুলো হতে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের সৌধ ও মন্দির নির্মাণ রীতি, তিগড়ার পদ্ধতি এবং চিত্রকলা কেমন ছিল, তা জানতে পারি।

বহু পণ্ডিত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের ফলে সুদূর অতীত আমাদের নাগালের মধ্যে এসেছে। তথাপি প্রাচীন যুগের সব কথা জানা যায়নি। এখনও এমন বহু বিষয় আছে, যে-সব সম্বন্ধে আমাদের খুবই সামান্য জানা সম্ভব হয়েছে। এখনও অনেক ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে দেখা হয়নি। সেটা সম্ভব হলে প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে আরো নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Eassay-Type Questions)

১। ইতিহাস বলতে কি বোঝায়? ইতিহাস পড়ে কি কি জানা যায় ?

২। প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। ঐতিহাসিক কাদের বলা হয়? তাঁরা ইতিহাসের যুগকে বিভাগ করেছেন কেন ?

২। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কি করেন ?

৩। প্রাচীন ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে লিপির প্রয়োজনীয়তা কি ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রচলিত অর্থে —— কাথাটির অর্থ হল —— কথা।

(খ) ইতিহাস কোন —— নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

(গ) মহারাজ —— পাহাড়ের গায়ে অনেক —— লিখিয়েছিলেন।

২। কম কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) প্রচলিত অর্থে ইতিহাস কথাটির অর্থ কি ?

(খ) তাম্রশাসন কাকে বলে ?

(গ) ভূর্জপত্র কি ? (ঘ) নৃতাত্ত্বিক কাদের বলে ?

দ্বিতীয় অধ্যায় | আদিম মানব

বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকেরা পৃথিবীর উদ্ভব ও মানব জাতির আবির্ভাব সম্পর্কে এক আজগুবি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, বিধাতার ইচ্ছাতেই পৃথিবী ও তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান একথা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে।

এবার পৃথিবীর উৎপত্তি ও মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাটা শোনা যাক। তাঁরা বলেছেন—সূর্যের সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক নক্ষত্রের সংঘাতের ফলে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ইত্যাদি গ্রহের মত পৃথিবীরও উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে। উত্তপ্ত ধরিত্রী ক্রমশঃ শীতল হলে, এখানে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে জলচর, তারপর উভচর এবং সবশেষে স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব হয়।

আজ থেকে একশো বছর আগে ডারউইন নামে একজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন—স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ক্রমে বানর জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়। আর এই ধরনের জীবের একটি শাখা থেকেই বানর-মানুষ বা আদি-মানবের উৎপত্তি হয়। বর্তমান মানুষ ও বানর-মানুষের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। বানর-মানুষের হাড়, খুলি, কঙ্কাল এবং তাদের ব্যবহৃত নানা জিনিস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। তারই ভিত্তিতে বানর-মানুষ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়েছে।

যে-সব দেশে বানর-মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের নামকরণ করা হয়েছে সে-সব দেশের নাম-অনুসারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাভাতে পাওয়া বানর-মানুষের নামকরণ করা হয়েছে জাভার বানর-মানুষ। এমনি ভাবে ইউরোপ মহাদেশের জার্মানীর হাইডেলবার্গ ও নিয়েনডার্থেলের বানর-মানুষের যথাক্রমে নামকরণ করা হয়েছে হাইডেলবার্গ বানর-মানুষ ও নিয়েনডার্থেল বানর-মানুষ। এই সব

বানর-মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে পিকিং-মানবদের।

পিকিং-মানব ঃ আমাদের প্রতিবেশী গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীনদেশ। চীনের বর্তমান রাজধানী বেইজিং পূর্বে পিকিং নামে পরিচিত ছিল। পিকি-এর চল্লিশ মাইল দূরে চৌউ-কউ-তিন শহরে একটি গুহা আছে। তার নাম ড্রাগন-বোন হিল। সেখানে এক ধরনের বানর-মানুষের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদের নামকরণ করা হয়েছে 'পিকিং-মানব। পণ্ডিতদের অনুমান— আজ থেকে তিন লক্ষ বছর পূর্বে এরা ছিল পৃথিবীর বাসিন্দা। অনুসন্ধান চালিয়ে পিকিং-মানবদের কঙ্কাল, মাথার খুলি, হাড়গোড়, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে।


পিকিং-মানব

পিকিং-মানবেরা খুব সম্ভব আগুনের ব্যবহার জানত। তারা পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাত। গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে যে আগুন জ্বলে ওঠে, অনেক সময় ওরা তাও সংগ্রহ করে রাখত। আগুনের সাহায্যে ওরা ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ারের মাংস ঝলসে খেত, গুহাকে গরম রাখত এবং বড় বড় হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত। এছাড়া ওরা গাছের ফল-মূল খেয়ে উদর পূরণ করত। পিকিং-মানবদের দৈহিক ও মানসিক গঠন প্রণালী এ যুগের মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল। এরা আকারে ছিল বেঁটে, বড় মাথা, চওড়া চোয়াল এবং গায়ে ছিল অজস্র লোম। এরা হাঁটত কিছুটা কুঁজো হয়ে।

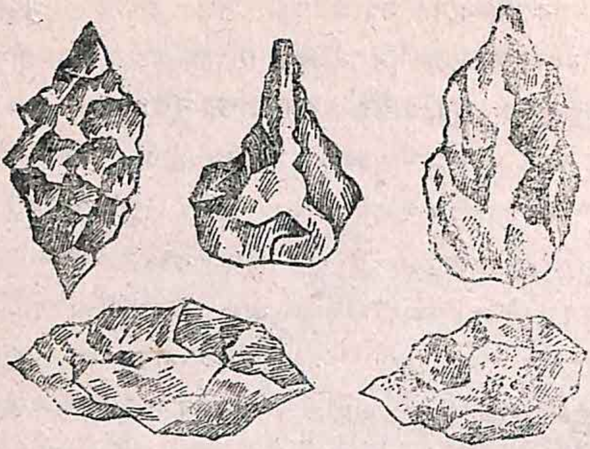
১৯২৭ সালে পেই নামে একজন চীনা প্রত্নতাত্ত্বিকের খননকার্যের ফলেই পিকিং-মানবদের সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকেরা এদের নামকরণ করেছেন 'সিনান থ্রোপাস' বা 'চীনের বানর-মানুষ'।

প্রস্তর যুগঃ পুরা-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগঃ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে বানর-মানুষ একদিন মানুষের আকার নিল। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার। বিরাট বিরাট জন্তু-জানোয়ারের মোকাবিলা কেবলমাত্র দুটো হাত দিয়ে করা অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন হাতের সাহায্যকারী অন্য কোন অবলম্বন বা হাতিয়ারের। তাই পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষ হাতিয়ার বানাতে শিখেছিল। কারণ খাদ্য সংগ্রহ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য মানুষের দৈহিক শক্তি যথেষ্ট ছিল না। এই অভাব পূরণের জন্য মানুষের হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়েছিল। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে আদিম মানুষ শুধু পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার জানত। সেজন্য এ যুগকে পণ্ডিতেরা নামকরণ করেছেন 'প্রস্তর যুগ'। পাথরে তৈরী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির উন্নতি লক্ষ্য করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন—পুরা প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ।

পুরা প্রস্তর যুগঃ আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে পুরা প্রস্তর যুগের সূচনা হয়। আনুমানিক পনরো হাজার খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত তা বজায় ছিল। এ যুগে মানুষ ভোঁতা ও অমসৃণ পাথরের ব্যবহার করত। অতিকায় হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পাথরগুলির আকার ছিল ত্রিকোণ ফলার মত। কোন-কোনটি আবার হাড় বা গাছের ভাঙ্গা ডালের মাথায় বেঁধে বর্শা বা কুঠারের মত ব্যবহার করত। পুরা প্রস্তর যুগের মানুষেরা দল বেঁধে শিকারে বেরুত। সম্ভবতঃ তারা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানত। এরা ছিল প্রধানতঃ শিকারী ও খাদ্যসংগ্রহকারী। সেজন্য তারা এক জায়গায় বেশী দিন থাকত না। এক অঞ্চলে যখন শিকার বা ফলমূল পাওয়া যেত, তখন তারা অন্য জায়গায় চলে যেত।

পুরা প্রস্তর যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না; তাই পশুর

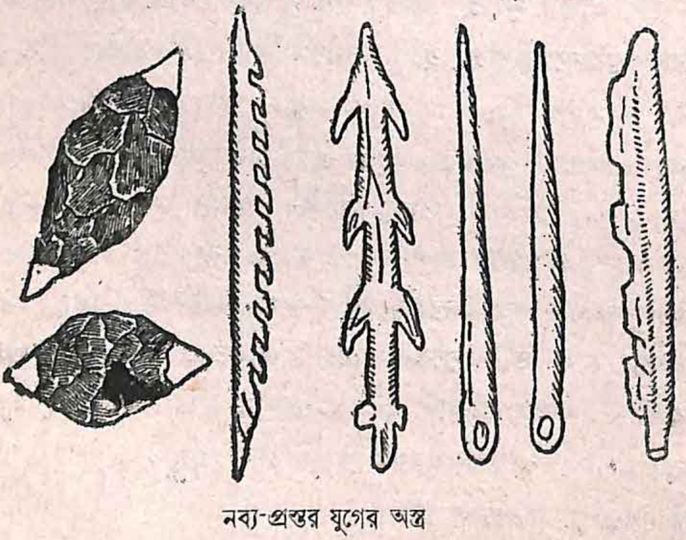
কাঁচা মাংস খেত ; কখনও কখনও নরমাংসও খেত ; উলঙ্গ থাকত ;



পুরাতন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র

পাহাড়ের গুহা কিংবা গাছের কোটরে তারা বাস করত। কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবনধারায় পুরা প্রস্তর যুগের মানুষের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

নব্য প্রস্তর যুগ ঃ কৃষির আবিষ্কার থেকে নগর সভ্যতার উৎপত্তি পর্যন্ত কালসীমাকে পুরাতত্ত্ববিদেরা **নব্য প্রস্তর যুগ** বলে উল্লেখ



নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্র

করেছেন। এ যুগে ভোঁতা পাথরগুলিকে মেজে-ঘসে ধারালো ও

ছুঁচালো করা হয়। এ সময়কার হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিগুলি অনেক উন্নত মানের ছিল। নব্য প্রস্তর যুগেই মানুষ যাযাবর খাদ্য সংগ্রাহক থেকে স্থায়িভাবে বসবাসকারী খাদ্য-উৎপাদনকারীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব দশ-পনরো খ্রীস্টাব্দে এই যুগের সূচনা হয়।

নব্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন যুগান্তকারী আবিষ্কার

কৃষি কাজের সূচনাঃ নব্য প্রস্তর যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান হল কৃষির আবিষ্কার। পণ্ডিতদের ধারণা, মেয়েরাই প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে। তখন পুরুষেরা শিকারে যেত; মেয়েরা ঘরে থাকত। তারা ঘাসের বীজ, ফলমূল প্রভৃতি জঙ্গল থেকে জুটিয়ে আনত। তারা প্রথমে লক্ষ্য করেছিল যে, আলগা মাটিতে বীজ পড়লে তা থেকে অঙ্কুর জন্মায়। সে অঙ্কুর বড় হয়ে গাছে পরিণত হয়। সেটা থেকে অপর্যাপ্ত বীজ পাওয়া যায়। এভাবেই কৃষিকাজের সূচনা হয়েছিল। কৃষির আবিষ্কারের ফলে খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হল। যাযাবরের মত না ঘুরে বেড়িয়ে এবার তারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বসতি গড়ে তুলল। তা ছাড়া এ সময়েই মানুষ পশুপালন, মৃৎশিল্প, বয়ন, এমন কি কুমোরের চাকাও আবিষ্কার করেছিল। এমনি করে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

পশুপালনঃ পশুপালন বলতে আমরা মেষ ছাগল, গরু, শূকর ইত্যাদিকে প্রতিপালন করা বুঝি। স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার পরে পশুপালনের সুবিধে হয়। প্রথমদিকে পশুপালনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যের অভাব-অনটন দেখা দিলে খোঁয়াড়ে রাখা পশুর মাংস খেয়ে সে প্রয়োজন মেটান। ক্রমে মানুষ অন্যান্য দরকারেও পশুপালন শুরু করে; যেমন—চামড়া, দুধ, লোম প্রভৃতি পাবার লোভে। এমন কি জীব-জন্তুর মলমূত্রকেও জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে।

মৃৎশিল্পঃ নব্য প্রস্তর যুগের সূচনায় মৃৎশিল্প অর্থাৎ মাটির

বাসন, পাত্র, হাঁড়ি প্রভৃতি নির্মাণ শুরু হয়। শুরুতে মৃৎশিল্পীরা হাত দিয়েই এসব গড়ত। পরে কুমোরের চাকা আবিষ্কৃত হওয়াতে মৃৎপাত্র নির্মাণ সহজসাধ্য হয়। অনেক সুন্দর ও মসৃণ পাত্র নির্মাণ হতে থাকে।

বয়ন বিদ্যা ঃ নব্য প্রস্তর যুগের অন্যতম অবদান হল সূতা কাটা ও কাপড় বোনা। সে আমলে খুব সম্ভব তুলা, পশম প্রভৃতি থেকে সুতা কেটে তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন করা হত।

গৃহনির্মাণ ঃ নব্য প্রস্তর যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল গৃহনির্মাণ। সাধারণতঃ জলাশয়ের ওপর বাঁশ পুঁতে গৃহনির্মাণ করা হত। একে বলা হয় হ্রদবসতি। সুইজারল্যাণ্ডে এরূপ বহু হ্রদ বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তা ছাড়া গুহাগুলিকেও আরও নিরাপদ করে তোলা হয়। বোধ হয় হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই নব্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা বাসস্থানকে নিরাপদ করে তোলার চেষ্টা করত।

পরিবহণ-ব্যবস্থা ঃ নব্য প্রস্তর যুগের সূচনায় গরু-মোষ জাতীয় জন্তুকে স্থলপথে পরিবহণের কাজে লাগান হত। পরবর্তীকালে কুমোরের চাকা আবিষ্কৃত হওয়াতে চাকা লাগিয়ে স্থল-পরিবহণের উন্নতি ঘটান হয়। জলপথে কয়েকটি গাছের আঁটি বেঁধে ভেলার মত নৌকা বানানো হত। কখনও কখনও প্রকাণ্ড গাছের মাঝখানটা খুদে গর্ত করে নৌকার মত কাজে লাগাত। এ ধরনের নৌকা অবশ্য সমুদ্রের উপকুল অঞ্চলে গমনাগমন করত।

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত ঃ একদিকে কৃষিকাজ ও পশুপালন এবং অন্যদিকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নব প্রস্তর যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ বা দল বেঁধে থাকতে শুরু করে। একসঙ্গে বা দলবেঁধে থাকতে গেলে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। তখন আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। তখন আইন কানুনের প্রচলন হয়নি। তবুও সকলে মিলে মিশে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। কখনও কখনও প্রবীণ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সকলে পালন করত।

নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিঃ সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম, ভাষা, শিল্পকলা ইত্যাদির বিকাশ। এই সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ ঘটে নব্য প্রস্তর যুগে।

আদিম মানুষের কোন ভাষা ছিল না। তখন আকার-ইঙ্গিত কিংবা মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করত।

নব্য প্রস্তর যুগে চিত্রাঙ্কন শিল্পের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। সে সময়কার গুহায় আঁকা অনেক চিত্র পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকে



আলতামিরা গিরিগুহায় আঁকা চিত্রসমূহ

তাদের বিশ্বাস ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে ধারণা করা চলে। স্পেনের আলতামিরা গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলিতে গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে।

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির বিকাশকে ভয়ের চোখে দেখত। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি এ-সব কিছুর পেছনে তারা ভাবত কোন-না-কোন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব। এ ছাড়া কুমীর, সাপ, বাঘ প্রভৃতি জন্তুকেও নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ অপ্রাকৃত শক্তিধর বলে ভাবত। একদল মানুষ দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী রূপে আবির্ভূত হল। পরবর্তীকালে এরাই সমাজে হল পুরোহিত। নব্য প্রস্তর যুগের মাটির তৈরী অনেকগুলি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি হল মাতৃদেবীর মূর্তি। পণ্ডিতদের অনুমান কৃষিকাজের সূচনা হতেই মানুষ জমিকে দেবী জ্ঞানে পূজা করত।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Eassay-Type Questions)

১। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে কি কি মত প্রচলিত আছে ?

২। পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারার পরিচয় দাও।

৩। নব প্রস্তর যুগের মানুষদের খাদ্য উৎপাদনকারী বলা হয় কেন ?

৪। নব প্রস্তর যুগে পশুপালন, মৃৎ-শিল্প ও গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। পিকিং-মানবদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। নব প্রস্তর যুগে পরিবহণের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটেছিল ?

৩। নব প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরিচয় দাও।

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective-Type Questions)

১। অল্প কথায় উত্তর দাও :

(ক) জাভাতে কিসের সন্ধান পাওয়া গেছে ? (খ) কার চেষ্টার ফলে পিকিং-মানবদের কথা জানা সম্ভব হয়েছে ? (গ) হ্রদ-বসতি কি ? (ঘ) স্পেনের আলতেমিরা গুহায় কিসের সন্ধান পাওয়া গেছে ? (ঙ) কৃষির আবিষ্কার কারা করেছিল —— পুরুষ না নারী ? (চ) নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার কিরূপ ছিল ? (ছ) সিনানথ্রোপাস বলতে কি বোঝায় ?

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু ব্যবহারের যুগের সূচনা : তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগ

প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ দিশেহারা হয় নি। নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন করে সে চেয়েছে সব রকমের প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে ; আর সেই জয়যাত্রা মানুষের কাছে এনে দিয়েছে প্রকৃতির বিজয়মাল্য। অরণ্যচারী মানুষ একদিন পাথরের হাতিয়ার বানিয়েছিল। কিন্তু সেটা দিয়ে তো সব কাজ মেটে না। সেজন্যই মানুষ নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য উঠে-পড়ে লাগল। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ পেল ধাতুর সন্ধান। প্রথম যে ধাতু আবিষ্কৃত হল, সেটা তামা, তারপর তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ। তামা ও ব্রোঞ্জের পরে এসেছে সোনা ও রূপা।

তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হওয়ার সময়কালকে বলা হয় **তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ**। সময়ের হিসাবে সেটা আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগের কথা। এ যুগে এসে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবন-ধারায় কোন্ কোন্ দিকে থেকে রূপান্তর দেখা দিল, এ অধ্যায়ে আমরা তারই আলোচনা করব।

নগরের পত্তন ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর : নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস, কৃষি ও পশুপালন। কিন্তু ধাতুর ব্যবহার শুরু হওয়ার পরে, আগের উৎপাদন ব্যবস্থায় এল রূপান্তর ; তাই গ্রামই যথেষ্ট নয়, বেচা-কেনা ও যোগাযোগের জন্য কেন্দ্রস্থল দরকার। সেজন্য এই সময়ে পত্তন হল শহর বা নগরের। এখন কারিগরি বিদ্যারও ধীরে ধীরে অগ্রগতি ঘটছে। সবাই আর চাষের কাজে লেগে নেই। যে কুমোর মাটির বাসন বানিয়েছে, যে তাঁতি কাপড় তৈরি করেছে, যে কারিগর ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেছে—এরা সবাই এসে ভিড় করল নগরে। এখানেই চলল বেচা-কেনা, আর

সমাজে কোন জিনিসের কেমন চাহিদা, তার আলাপ-আলোচনা। এ সময়ে গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হল।

কারিগরি দক্ষতা, বিনিময় ও সামাজিক রূপান্তরঃ আগেই বলা হয়েছে ধাতুর ব্যবহার শুরু হবার পরে উৎপাদন পদ্ধতিতে এল পরিবর্তন। সমাজের চাহিদা আর খাদ্য-বস্ত্র-পশুপালনে সীমাবদ্ধ নেই।

এই সময়ে কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষ শিল্পীর আবির্ভাব হল। ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার নির্মাণে লেগে গেল একদল। কেউ বা বাড়ি-ঘর, মন্দির নির্মাণের কাজে লেগে পড়ল; আর একদল মাটির বাসন-কোসন নির্মাণ-কাজেই মেতে রইল। অন্য দল হাতির দাঁত কিংবা পাথরের তৈরী সুদৃশ্য দ্রব্য নির্মাণের কাজে হাত দিল; তাঁতি বানাতে লাগল কাপড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও জমজমাট হয়ে উঠল।

প্রয়োজন পড়ল বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের রুটি-রুজির সংস্থানের। সেজন্য চালু হল বিনিময়-প্রথার। সেটা প্রথমে চলত সরাসরিভাবে—যাকে বলে প্রত্যক্ষ বিনিময়; যেমন—তাঁতির চালের দরকার, আর চাষীর দরকার কাপড়ের। দুজন দুজনকে দুরকম জিনিস দিয়ে প্রত্যক্ষ বিনিময় করত। এর উল্টো হলে ঘটত অনাসৃষ্টি; সব চাষীর দরকার লাঙ্গলের আর তাঁতির দরকার চালের। সে-ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটত। এই দুরবস্থা দূর করা বা মোচন করার জন্য হল ব্যবসায়ীর আবির্ভাব। সে দুজনেরই প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দিতে পারত; তাই সবাই এসে ভিড় করত তার কাছে। এমনিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরে সমাজে একদল উৎপাদিত পণ্যের বাড়তি লাভ কামাতে লাগল। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ধনী হয়ে উঠল। তার ফলে সামাজিক জীবনধারায় আরও রূপান্তর দেখা দিল।

বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রের সম্ভাবনাঃ এ যুগে পণ্য উৎপাদনে রূপান্তরে ঘটে। তাতে সমাজে একদল সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারা পরিশ্রম না করে অন্য এক দলের পরিশ্রমের ফলে

উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ভোগ করত। তার ওপর নিজেদের মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করত। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় — ধনী আর দরিদ্র, শোষক আর শোষিতের উদ্ভব হল এই সময় থেকেই।

এক একটি পরিবার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তার আকার অনেকটা বটগাছের মত হত। নানাদিকে ডালপালা বা শিকড় গজালেও বটগাছ কিন্তু একটিই। গোষ্ঠী ব্যাপারটাও তেমনি ধরনের। **একটি পরিবার যতই ভাঙ্গুক, রক্তের সম্পর্কসূত্রে তো তারা এক। একেই বলা হত গোষ্ঠী।**

বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা পৃথক পৃথক থাকত। একটি গোষ্ঠী অন্য আর একটি গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হত। এক কারণ হয়ত থাকত অন্য গোষ্ঠীর জমি বা সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া এবং অন্য পক্ষ হতে সেটার প্রতিরোধের চেষ্টা করা। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা কোন একটি নগরে বাস করত। নিজেদের মধ্য থেকে তারা কাউকে তাদের নেতা মনোনয়ন করত ; আর এইভাবে তার অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সংগঠিত হয়। এভাবেই তখন পাওয়া গেল আধুনিক রাষ্ট্রের পূর্বাভাস।

নদীতীরে সভ্যতা উদ্ভবের কারণ : তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাগুলো প্রধানতঃ নদীতীরে গড়ে উঠেছিল।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলি বিকশিত হয়। সেগুলো নদীতীরে গড়ে উঠেছিল। এর পেছনে কোন আকস্মিক কারণ নেই। প্রথমতঃ, জলের আর এক নাম জীবন। মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ার সকলেরই তৃষ্ণা মেটায় জল। নদীতীরে থাকলে পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত জল। দ্বিতীয়তঃ, নদীতীরে পলি জমিতে চাষ করা সুবিধাজনক। সেখানে ফসলের উৎপাদনও হয় বেশী। কৃষির প্রয়োজনে নদী থেকে খাল কেটে জল-সেচের ব্যবস্থা করা ছিল সহজ। তৃতীয়তঃ, চাষ-আবাদ, খাল কাটা ও বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু লোকের দরকার। ফসলের উৎপাদন বেশী হওয়াতে এদের ভরণ-পোষণও সহজসাধ্য ছিল। চতুর্থতঃ, নদীতীরে প্রচুর ঘাস এবং

গাছপালা জন্মায়। তার ফলে পশুচারণের পক্ষে সুবিধা হয়। তাই একদল নদীতীরে বাস করে পশুপালনের কাছে লিপ্ত থাকে। পঞ্চমতঃ, নদীতীরের আবহাওয়া খুব ভালো। সেটা বসবাসের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। ষষ্ঠতঃ, নদী যেন প্রকৃতির দেওয়া পথ। নদীতীরে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ কাঠের তৈরি নৌকায় করে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি ও রপ্তানি করত। তাতে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। সপ্তমতঃ, এক সঙ্গে বহু লোকের বসবাসের ফলে তা থেকে সমাজের সৃষ্টি হয়। নিয়ম-শৃঙ্খলা মানবার প্রয়োজনীয়তা থেকে রাষ্ট্র ও আইন-কানুনের জন্ম হয়। অষ্টমতঃ, নদীতীরে ফসল উৎপাদন বেশি হওয়ায় অনেক মানুষ চাষ-আবাদের পরিবর্তে অন্য কাজে মনোনিবেশ করে। এর ফলে অনেক নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হতে থাকে। অনেকে আবার সংস্কৃতি চর্চাও শুরু করেছিল।

প্রধানতঃ এইসব কারণে নদী-উপত্যকায় সভ্যতার উদয় হয়েছিল বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Eassy-Type Questions)

১। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ বলতে কি বোঝ? এ সময়ে কিভাবে নগরের উদ্ভব ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর দেখা দিল?

২। কিভাবে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে কারিগরি দক্ষতা, বিনিময় প্রথা ও সামাজিক রূপান্তর দেখা দিল?

৩। তাম্র ও ব্রোঞ্জের যুগের সভ্যতাগুলি কেন নদীতীরে গড়ে উঠেছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer-Type Questions)

১। গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ?

২। তাম্র ও বোঞ্জ যুগে সবাই নগরে ভিড় করল কেন?

৩। কি কি কারণে মানুষ সংস্কৃতি-চর্চায় মন দিতে পেরেছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

(ক) নদীতীরের — খুব ভালো। (খ) —পদ্ধতির পরিবর্তনে সমাজে একদল — শ্রেণীর উদ্ভব হয়। (গ) একটি — যতই ভাঙুক — সম্পর্ক সূত্রে তারা তো এক।

(খ) **এক কথায় উত্তর দাও:** (ক) প্রথম কোন্ ধাতু আবিষ্কৃত হয়? (খ) কি কি দিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়? (গ) বিনিময় প্রথা বলতে কি বোঝ? (ঘ) নদীতীরের আবহাওয়া কেমন?

———

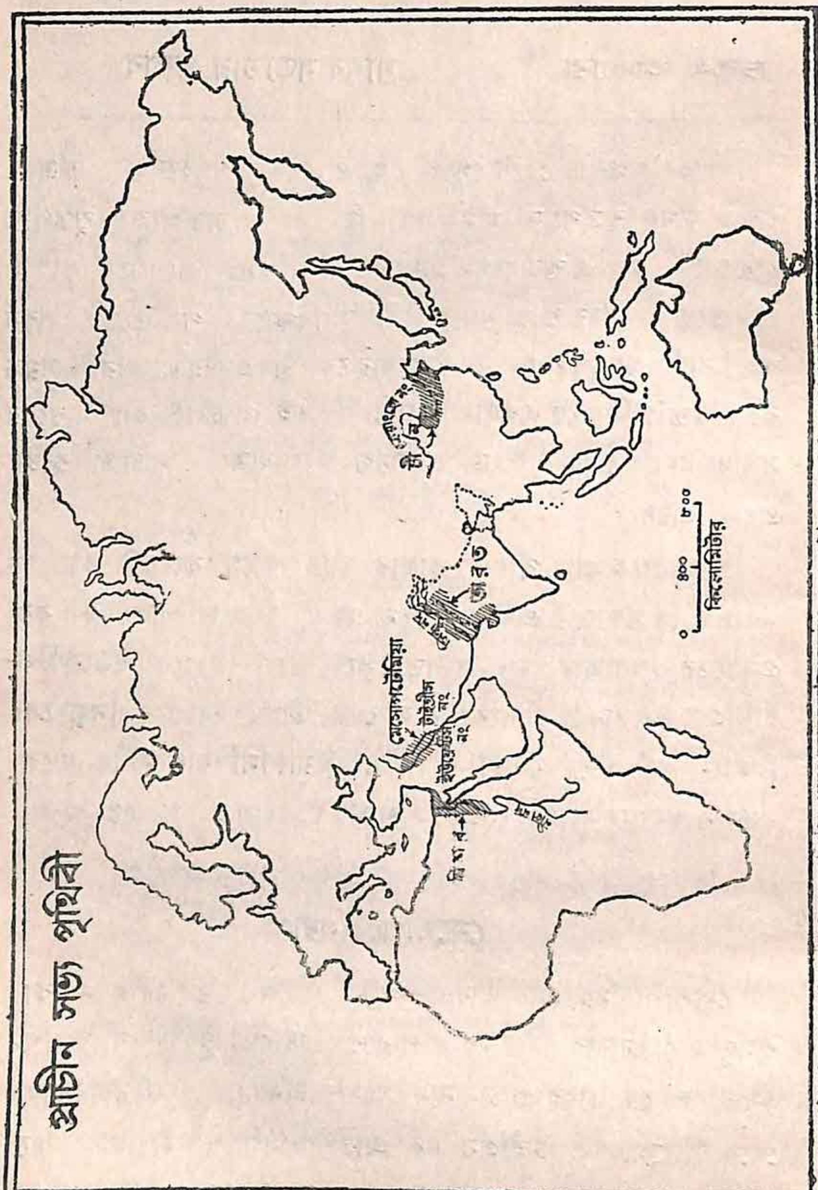
চতুর্থ অধ্যায়	মানব সভ্যতার প্রভাব

রাতের অন্ধকার কেটে গেলে হয় প্রভাতের আবির্ভাব। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সূত্রপাতে মানব-সভ্যতার সেই প্রভাতকালের সূত্রপাত হয়েছিল। নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষেরা যেন সেই প্রভাতের কাকলি শুনিয়েছে। কৃষির ন্যায় যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর হতেই মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। জীবনধারাকে আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ করার জন্য চালিয়েছে একটানা প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাই হল মানুষের সভ্যতা বলতে বোঝায় উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা। সভ্যতা সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে কয়েকটি বড় বড় নদীর তীরে সভ্যতার প্রভাতের সূচনা হয়। বর্বরতার কালিমা দূর করে প্রভাতের আলোর মত সভ্যতা ফুটে উঠল—ইরাকে **ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস** উপত্যকায়, মিশরের **নীলনদের** তীরে, ভারতের **সিন্ধুনদের** কিনারে, আর চীনে **হোয়াং-হো** এবং **ইয়াং-সিকিয়াং** নদীর ধারে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইসব সভ্যতার ইতিহাস জানার চেষ্টা করব।

মেসোপটেমিয়া

মেসোপটেমিয়া গ্রীক ভাষার শব্দ। এর অর্থ—দুই নদীর মধ্যকার স্থলভূমি বা দোয়াব। আরব ও পারস্যের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড—যাকে এখন ইরাক বলা হয়, তারই প্রাচীন নাম মেসোপটেমিয়া। আর্মেনিয়ান পর্বত থেকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদ প্রায় পাশাপাশি এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেজন্যই দেশটির এরূপ নামকরণ হয়। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম ছিল সুমের—আর এর উত্তর-পূর্বে ছিল ব্যাবিলনিয়া ও আক্কাদ। সুমের অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল


প্রাচীন সভ্য পৃথিবী
মেসোপটেমিয়া
ভারত
০ ৪০০ ৮০০
কিলোমিটার

শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা এই সুমের জাতিরই সৃষ্টি। সেইজন্যই এর আর এক নাম—সুমেরীয় সভ্যতা।

এই সভ্যতা প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরানো। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে এই সভ্যতা প্রাচীনতম। কারণ এই সভ্যতার অনুরূপ নিদর্শন ভারতে সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানে পাওয়া গেছে। অন্যান্য সভ্যতা হতে এই সভ্যতা কত প্রাচীন, সেটার সঠিক হিসেব-নিকেশ দেওয়া কঠিন। তবুও বলা চলে—অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে হয়ত বা অল্প কিছুদিনের পুরনো এই সভ্যতা।

জমির উর্বরতা ও শস্য ঃ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, চাষ-বাসের জন্য জলের দরকার। মেসোপটেমিয়াতে বৃষ্টিপাত কম হত। কিন্তু দুটো নদী থাকার ফলে নিম্নাঞ্চলের জমি ছিল উর্বর। সেখানকার জমিতে যব ও বালি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এই অঞ্চলের



চারপাশে ছিল অসংখ্য খেজুর গাছ। খেজুরও পাওয়া যেত প্রচুর। খেজুরকে মেসোপটেমিয়ার মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করত। ঐ গাছের আঁশ থেকে দড়ি, ঝুড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হত। খেজুর ও খেজুর গাছ মেসোপটেমিয়াবাসীর জীবনে খুবই অপরিহার্য ছিল। সেজন্য খেজুর গাছকে তারা 'জীবন-বৃক্ষ' বলত।

বন্যা প্রতিরোধ ঃ ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীতে মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দিত। চারদিক জলে প্লাবিত হত। এই বন্যা প্রতিরোধের জন্য সুমেরীয়রা নদীতে বাঁধ দিত। সাধারণতঃ পোড়ামাটির ইট ও কাদা দিয়ে বাঁধ দেওয়া হত। আর বাঁধের জল খাল কেটে সুকৌশলে তারা বহু দূরে ছড়িয়ে দিত। সেজন্য বন্যা হলেও এখানে কখনও জল জমত না। সে কারণেই নদীর পলিমাটি থেকে এখানে প্রচুর ফসল ফলান সম্ভব হত।

বিভিন্ন পেশা ঃ সুমেরীয়রা চাষ, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্য—সব দিকেই ছিল পারদর্শী। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। এদের প্রধান গৃহপালিত জন্তু ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। এখানকার তাঁতিরা খুবই সূক্ষ্ম কাপড় বুনতে পারত; কুম্ভকাররা বানাত সুদৃশ্য মাটির বাসন-কোসন। ব্যবসায়ীরা জলপথে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত।

মেসোপটেমিয়াবাসীরা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। তাছাড়া গাছের আঁশ থেকে তৈরী রেশমের ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না। তাঁতীরা তাঁত বুনে বা সূতা কেটে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। মেসোপটেমিয়ায় অনেক কাচের তৈরী জিনিস পাওয়া গেছে। এ-সব নিদর্শন দেখে অনুমান করা যায় যে, এক শ্রেণীর কারিগর কাঁচ শিল্পকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

এমনি ভাবে দেখা যায় মেসোপটেমিয়াবাসীরা কৃষিকাজ ও পশুপালন ব্যতীত মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, কাচ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। অনেকে আবার খাল-খনন, বাঁধ দেওয়া, পথঘাট তৈরী করা ইত্যাদি কায়িক শ্রমের দ্বারাও জীবিকার্জন করত।

সুমেরীয়দের কৃতিত্ব ঃ সুমেরীয়রা বড় বড় শহর গড়ে তুলত। সেখানে রাজা ও তাঁর প্রধান রাজকর্মচারীরা বাস করতেন। এরা পোড়া মাটির তৈরি ইট দিয়ে সুন্দর সুন্দর সৌধ ও গৃহ নির্মাণ করতে পারত। গৃহগুলির নির্মাণকৌশল ছিল ভারি সুন্দর। এরা ভাল ভাল কাদামাটি

ও পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে বানাত 'জিগুরেট' নামে সুউচ্চ মন্দির। এরা দেওয়ালের গায়ে রঙ দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। এই জাতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি থেকেই সম্ভবতঃ **'ফ্রেসকো'** রীতির উদ্ভব হয়। তারা নানা রঙের চক্‌চকে পাথর জুড়ে দেয়ালে গাছ বা পশুর ছবি এঁকে রাখত।

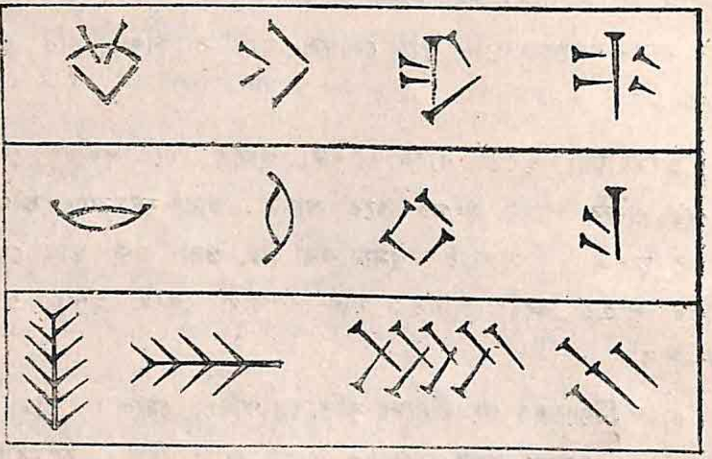
সুমেরীয়রা সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে দূরদেশ থেকে সুন্দর সুন্দর পাথর সংগ্রহ করে আনত; কারণ সুমেরুতে কোথাও পাথর ছিল না। সেজন্যই অনুমান করা যায়, ওরা অন্য স্থান থেকে পাথর সংগ্রহ করে আনত; আর সেগুলি কেটে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাত।

ধাতব বিদ্যাতেও সুমেরীয়দের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। তামা ও ব্রোঞ্জ ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও এদের জানা ছিল। সুমেরীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল সমৃদ্ধ। জলপথে ও স্থলপথে দু'দিকেই এদের ব্যবসা চলত। এরা ভারবহনের জন্য গরু, মোষ জাতীয় জন্তুকে যানবাহনের কাজে লাগাত। অন্যদিকে কাঠের তৈরী নৌকোয় চড়ে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। ব্যবসাক্ষেত্রে কেনাবেচা চলত প্রধানতঃ বিনিময়ের মাধ্যমে।

সুমেরীয় লিপি ঃ সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল—তাদের **কিউনিফর্ম লিপি** বা সুমেরীয় লিপি। এগুলি ছিল চিত্র-বিচিত্র সংকেতলিপি। প্রথম প্রথম ওরা যা বোঝাতে চাইত, তার সবটুকু ছবি এঁকে বোঝাত। ছবির সাহায্যে লিখন পদ্ধতি মোটেই সুবিধা-জনক ছিল না। কারণ ছবির পর ছবি এঁকে মনের সব কথা বোঝানো কঠিন ছিল।

সুমেরীয়রা টালির মত কাদামাটির ফলক বা বোর্ড তৈরি করত। আর এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর লিখিত তাদের চিত্রলিপি। এদের এইরূপ চিত্রলিপির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন সুসা নগরীতে। এই লিপি থেকে এদের অনেক অজানা ইতিহাস জানা

যায়। আদিম মানুষের মনের ভাব প্রকাশের আকুলতা পুরা-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যেও ছিল। তারা নিছক আঁকাবাঁকা



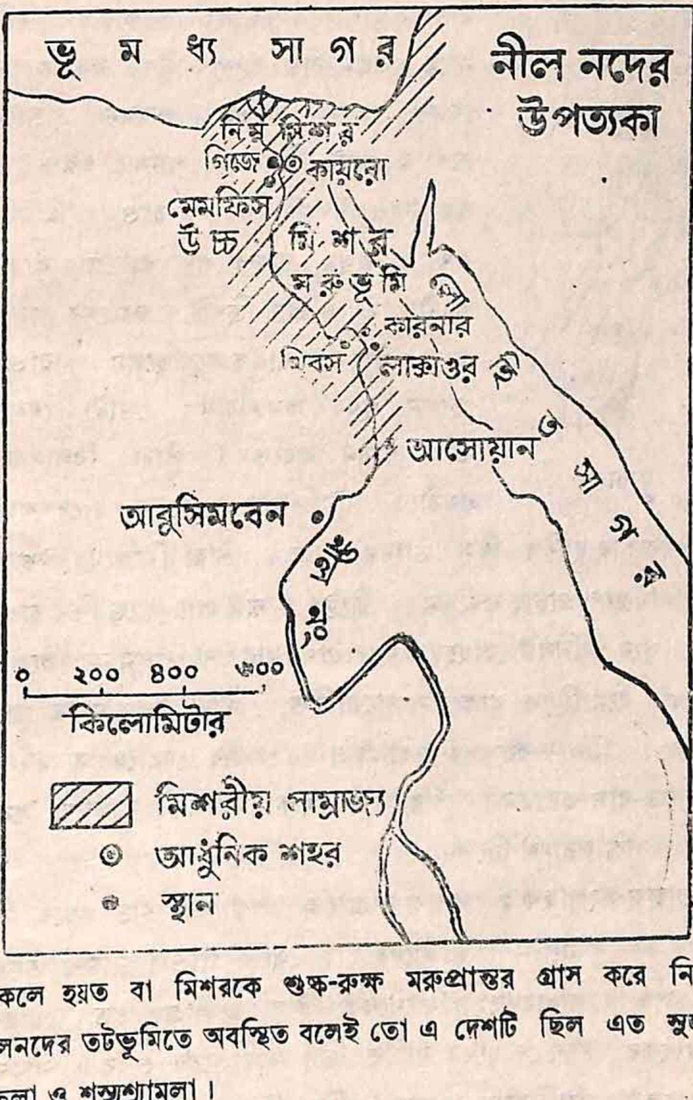
সুমেরীয় লিপি

ছবি এঁকে সেটা সারত। কিন্তু সুমেরীয়রা সেটায় অনেক সংকেত-চিহ্ন দিল। পরবর্তীকালে মিশরীয়দের হাতে সেটা নূতন আকার পায়।

মিশরীয় সভ্যতা

অবস্থান ও উর্বরতা: সুমেরীয় সভ্যতার মত মিশরীয় সভ্যতাও অতি প্রাচীন। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে মিশর দেশ। নীলনদ যেন এই দেশটির মায়ের মত। কারণ মিশরদেশ ছিল শুষ্ক ও মরুময়। দীর্ঘ নীলনদ প্রায় চার হাজার মাইল পথ এদেশের উপর দিয়ে বয়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে। মিশরের দক্ষিণে সুদানের পার্বত্য অঞ্চলে আছে শুধু পাথর আর পাহাড়। এখানে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে নীলনদ বয়ে গেছে মরুভূমির পাশ দিয়ে। ভূমধ্যসাগরের কাছে এসে ছোট ছোট উপনদীতে ভেঙ্গে পড়েছে। মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। কারণ প্রতি বছর নীলনদে প্রবল বন্যা দেখা দিত; আর তাতে দু'কূল ছাপিয়ে নদীর জল শুষ্ক মরুপ্রান্তরে যেন শান্তিবারি

সেচন করত। জল থিতিয়ে গেলে স্তরে স্তরে পলি জমত। নরম পলিমাটিতে চাষ করে মিশরীয়রা ফলাত সোনার ফসল। নীলনদ না



থাকলে হয়ত বা মিশরকে শুষ্ক-রুক্ষ মরুপ্রান্তর গ্রাস করে নিত। নীলনদের তটভূমিতে অবস্থিত বলেই তো এ দেশটি ছিল এত সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা।

ফারাও, পুরোহিত, রাজস্ব-সংগ্রাহক ও সৈনিক :

ফারাও : ফারাও অর্থ হল বড় বাড়ির বাসিন্দা। মিশরের রাজাকে বলা হত ফারাও। মিশরে বহু ছোট ছোট নগর-রাজ্য

ছিল। এই সব রাজ্যগুলি প্রথমে ছিল পৃথক পৃথক। পরে মিশর-বাসী উপলব্ধি করল গোটা উপত্যকাটি এক রাজ্যের শাসনে থাকা দরকার। মিনিস নামে একজন রাজা সম্পূর্ণ মিশর জয় করেন। সেজন্য তখন হতেই একজন সম্রাটের অধীনে গোটা মিশরদেশ শাসিত হয়। এই সম্রাটেরও উপাধি হয় ফারাও। মিনিস-ই এখানে প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মিশরে প্রায় ত্রিশটি রাজবংশের অসংখ্য ফারাও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। ফারাওগণ ছিলেন খুবই ক্ষমতাবান। গোটা দেশকে তাঁরা শাসন করতেন। তাঁরা বিলাসবহুল নগরীতে অট্টালিকায় থাকতেন। দেশশাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁদের উপর। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রচার করতেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে **মিনিসই** বোধহয় মিশরে প্রথম রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন।


ফারাও

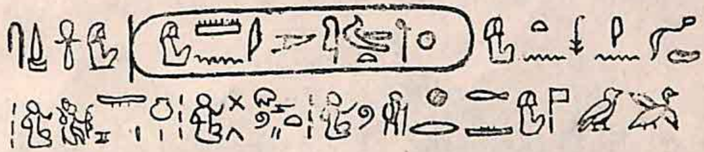
ধর্মে-কর্মে নিযুক্ত থাকতেন **পুরোহিত**। তাঁরা তিথি-নক্ষত্র গণনা করতেন। মিশরে বহু দেব-দেবী ছিল। সে-সব দেব-দেবীর মন্দিরে পুরোহিত বাস করতেন। তাঁরা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। রাজাকে সময়-অসময়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন।

রাজস্ব-সংগ্রাহকঃ রাজস্ব-সংগ্রাহক প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে আনতেন। প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া রাজস্ব হতেই দেশ চলত। সাধারণতঃ কৃষি থেকেই এই রাজস্ব সংগ্রহ হত। রাজস্ব সংগ্রাহকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল ফারাওয়ের ওপর। রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা প্যাপিরাস কাগজে রসিদ দিতেন এবং পাওনা-গণ্ডার নির্ভুল হিসেব-নিকেশ রাখতেন।

সৈনিকেরা যুদ্ধ করত। ফারাওদের অধীনে ছিল বিরাট সৈন্য-বাহিনী। দেশরক্ষার জন্য সৈনিকেরা ঢাল, তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে

যুদ্ধ করত। যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত না, কখনও কখনও ওরা বাঁধ-নির্মাণ, খাল-খনন ও রাস্তা তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকত।

মিশরীয় লিপি ঃ নলখাগড়ার তৈরী প্যাপিরাস নামে এক প্রকার কাগজের ওপর মিশরীয়রা লিখত। এদের অক্ষরগুলো ছিল ছবি। সেগুলোর উচ্চারণ-পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। প্যাপিরাস কাগজ ছাড়া পাথর কুঁদেও তারা লিখত। এদের লিখন-পদ্ধতিকে বলা হত **হায়ারোগ্লিফিক্‌**। মিশরীয় 'হায়রোগ্লিফিক্‌' লিপির সঙ্গে গ্রীক ভাষা-লিপির অনেকটা

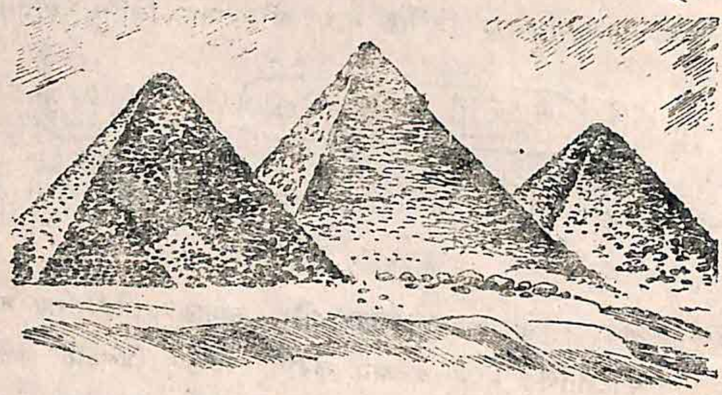


মিশরীয় লিপি

মিল পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে গ্রীক ভাষার প্রতিলিপির সঙ্গে মিলিয়ে **শাঁপোলিও** নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই হায়রোগ্লিফিক্‌স্‌ লিপিতেই রাজার আদেশ এবং আইন-কানুন লেখা হত। সেজন্য একাজে একদল রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এরাই ছিল প্রাচীন মিশরের হিসাবরক্ষক বা কেরানী।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ মিশরীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল উন্নত। ব্যবসা চালাত ব্যবসায়ীরা। গরু, মোষ জাতীয় জন্তুকে প্রথম ভার বহনের কাজে লাগান হয়। পরবর্তীকালে জন্তুতে টানা গাড়ির ব্যবহারও প্রচলিত হয়। ব্যবসা চলত বিনিময়ের মাধ্যমে। সম্ভবতঃ সেটা প্রথমে ছিল প্রত্যক্ষ বিনিময়; পরে হয় পরোক্ষ বিনিময়। কোন মূল্যবান ধাতুখণ্ডকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হত। দূর দেশের সঙ্গে জলপথে কাঠের তৈরী নৌকার সাহায্যে মিশরীয়রা বহির্বাণিজ্য চালাত। অন্য দেশ থেকে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী এনে তারা ফারাওকে উপহার দিত। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীরা স্বদেশ থেকে বস্ত্র ও খাদ্যশস্য নিয়ে যেত; আর অন্য দেশ থেকে আনা হত হাতির দাঁতের তৈরী জিনিস অথবা ধাতুনির্মিত অলঙ্কার।

পিরামিড ঃ পিরামিড হল মিশরের ফারাওদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত বিচিত্র সমাধি-মন্দির। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, মৃত্যুতেই জীবনের সব শেষ নয় এর পরেও জীবন থাকে। সেই নূতন জীবন শুরু হয় পাতাল-দেবতা ওসিরিস-এর রাজ্যে। তাই তারা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে শবদেহকে মূল্যবান কাপড়ে মুড়ে শুইয়ে রাখত। মৃত-দেহের সঙ্গে রাখত ভাল ভাল খাবার, সুদৃশ্য পানপাত্র, মূল্যবান



মিশরের পিরামিড

অলঙ্কার, সুন্দর সুন্দর বাসন-কোসন – আরও কত কি! তাদের দৃষ্টি ছিল মৃত-ব্যক্তি যেন পর-জীবনে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট না পায়। পরে মিশরে যখন রসায়নবিদ্যার ব্যাপক চর্চা শুরু হয় – তখন তারা মৃত-দেহকে এক প্রকার আরক মিশিয়ে সংরক্ষণ করে রাখত। একে বলা হত মমি। ফারাও এবং অভিজাত ব্যক্তিদের মমির ওপরে থাকত সমাধি-মন্দির। এগুলি ছিল বিশাল চার কোণাচে ধরনের ইমারত। অসংখ্য শ্রমিকের একটানা কঠোর পরিশ্রমের ফলে এক-একটি পিরামিড তৈরী হত। অসংখ্য লোক দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করে গড়ে তুলত এই পিরামিড। মিশরের গিজে শহরের কাছে অসংখ্য পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্য ও নিখুঁত মাপজোঁক দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মিশরের ফারাওদের অমর কীর্তি পিরামিড আজও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্যরূপে গণ্য

হয়। প্রাচীন মিশরের তৃতীয় রাজবংশের সময় জোসার প্রথম পিরামিড তৈরি করলেন। তারপর থেকেই প্রত্যেক রাজাই পিরামিড তৈরি করাতেন। মিশরে শুরু হয় পিরামিডের যুগ। অবশ্য এক একটা পিরামিডে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় হত—হয়ত বা তার বিনিময়ে অসংখ্য মিশরবাসীকে সহ্য করতে হত দুঃখ-দুর্দশা আর বেদনাদায়ক শোষণের নিদারুণ যন্ত্রণা। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে টুটেনখামেন নামে একজন ফারাও-এর পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ফারাও-এর ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র, যেমন—খাট, বিছানা, আসবাবপত্র, পোশাক, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, ফুলদানি, পানপাত্র—আরও কত কি।

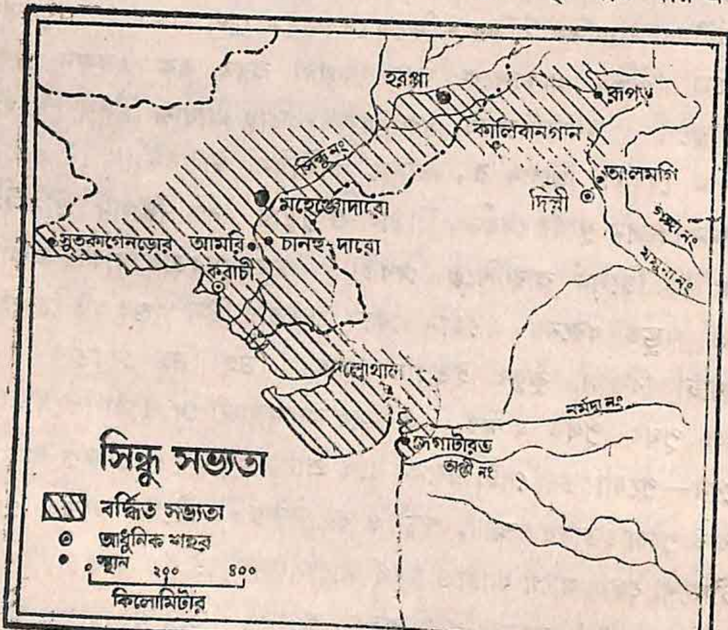
ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ নদীমাতৃক মিশর দেশের অধিবাসীরা ছিল প্রকৃতির উপর ষোল আনা নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টি—এই দুই-ই তাদের জীবনে বয়ে আনত চরম দুঃখ-দুর্দশা। সেজন্য মিশরীয়রা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবজ্ঞানে পূজা করত। প্রকৃতির বিচিত্র বিভিন্ন প্রকাশকে তারা কল্পনা করত এক একজন দেব-দেবীরূপে। অঞ্চলবিশেষে এক এক দেবতার প্রাধান্য ছিল। এদের প্রধান দেবতা ছিলেন **রা, আমন, ওসিরিস, টা** ইত্যাদি। রা ও আমন ছিলেন সূর্যের দেবতা, পাতাল ও মৃত্যুর দেবতা ছিলেন ওসিরিস এবং টা ছিলেন কারুশিল্পের দেবতা। এদের দেবতার আকার-প্রকার ছিল অদ্ভুত ধরনের। কোন কোন দেবতার ছিল পশুর মত চেহারা, মাথাটা বিড়াল, কুকুর ইত্যাদির মত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জন্য ছিল পৃথক পৃথক মন্দির। এই সব বদমেজাজী দেবতারা কিসে খুশি হবেন—পুরোহিতরা সেটা জানেন বলে প্রচার করতেন। সেজন্য সমাজে সবাই পুরোহিতদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয় করত। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চৌদ্দশো বছর আগে ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপই বহু দেবতার পূজা বন্ধ করে 'টা' দেবতার পূজা প্রচলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমন দেবতার পূজা শুরু হয়।

প্রধান প্রধান পেশা ঃ মিশরীয়দের প্রধান পেশা ছিল চাষবাস ও

পশুপালন। ফারাও দেশ চালাতেন। পুরোহিত ধর্ম-কর্ম ও শিক্ষা দানের কাজে লিপ্ত থাকতেন। সৈনিকরা যুদ্ধ করতেন। কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন অসংখ্য কারিগর। মিশরের মন্দির ও পিরামিড নির্মাণে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও স্থপতি বিদ্যায় তাঁদের অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় মেলে। এছাড়া সেখানকার তাঁতিদের খুব খ্যাতি ছিল। তাঁরা সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড় বুনত। কেউ কেউ রঙিন কাঁচের কাজ জানত। কেউ চামড়ার জিনিস বানাত। অন্য আর একদল মাটি বা ধাতুর পাত্র গড়ে তাকে কাঁচের মত পালিশ দিত, আর নক্শা এঁকে শৌখিন করে তুলত। ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশে রকমারি পণ্য বেচাকেনা করত।

সিন্ধু-সভ্যতা

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর তীরের মেসোপটেমিয়া কিংবা নীলনদের তটভূমিতে গড়ে-ওঠা মিশরীয় সভ্যতার অনুরূপ পৃথিবীর আর একটি



প্রাচীন সভ্যতা হল **সিন্ধু-সভ্যতা**। সিন্ধুনদের তীরে আজ হতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

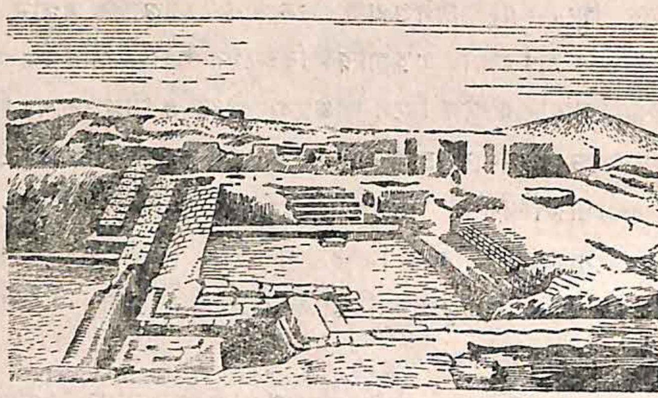
কিভাবে আবিষ্কৃত হল: ১৮২২ সালের কথা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ মঠের নিদর্শন অনুসন্ধানের জন্য খননকার্যে তখন ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি মাটির তলায় খননকার্য চালাতে গিয়ে এই বিলুপ্তপ্রায় সভ্যতার ভগ্নস্তূপের সন্ধান পান। এরপর তিনি তাৎকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহানীর সঙ্গে মিলে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধু দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খননকার্য চালান; আর তার ফলেই আবিষ্কৃত হয় এই **সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন**। এর আগে পর্যন্ত পণ্ডিতেরা প্রাচীন সভ্যতা বলতে মেসোপটেমিয়া কিংবা মিশরীয় সভ্যতার কথাই শুধু জানতেন। কিন্তু এই সভ্যতার ভগ্নস্তূপ আবিষ্কারের ফলে জানা গেল—আরও একটি প্রাচীন সভ্যতার কথা।

বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত সিন্ধু দেশের মণ্টগোমারী জেলায় ছিল মহেঞ্জোদড়ো। হরপ্পা ছিল পশ্চিম-পাঞ্জাবের লারকানা জেলায়। এই দুটি অঞ্চলই তখন ছিল বেশ উর্বর ও চাষের পক্ষে উপযোগী। সেজন্য আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল থেকে লোকজন এসে এখানে বসতি গড়ে তোলে। এই সিন্ধু-সভ্যতা কোন্ জাতির সৃষ্টি—এই প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। একদল বলেন, সুমেরীয়রা মেসোপটেমিয়া হতে এখানে এসে এই সভ্যতা গড়েছিল। অন্য দলের মত হল—দ্রাবিড় জাতিই এই সভ্যতার স্রষ্টা। তা যে জাতিই গড়ে তুলুক, এ-সভ্যতা যে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলির সমতুল্য, উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল—সে কথা বলাই বাহুল্য।

নগর পরিকল্পনা: সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। মহেঞ্জোদড়োতে যে নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে—সেটা ছিল সুন্দরভাবে পরিকল্পিত। এখানকার অধিবাসীরা পোড়া মাটির তৈরী ইটের বাড়িতে বাস করত। কোন কোন বাড়ি দ্বিতল-ত্রিতলও ছিল। বাসগৃহে আলো-বাতাস খেলার মত দরজা-জানালার ব্যবস্থা ছিল। এখানকার রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত ও সরু। এখানে ভূগর্ভে আবৃত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ও জল-নিষ্কাষণের ছোট-বড় নর্দমা ছিল।

(*) মহেঞ্জোদড়ো - সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায়,
হরপ্পা - পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায়

রাজপথের আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এখানে একটি স্নানাগারের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট। হরপ্পার নগর-পরিকল্পনাও মহেঞ্জো-



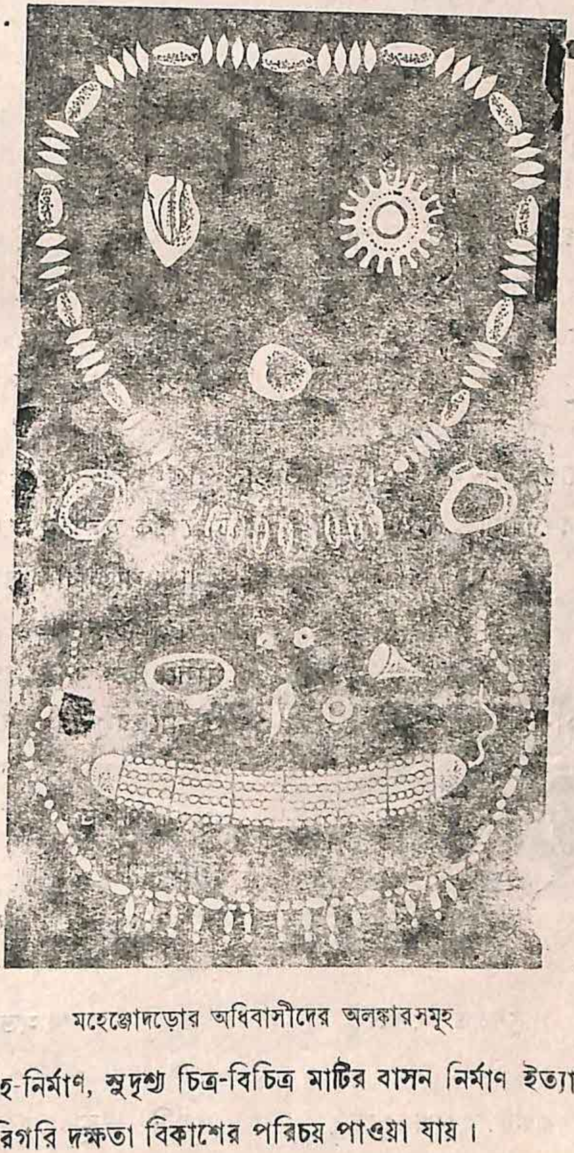
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

দড়োর মতই উন্নত ছিল। এই নগরীটি ছিল পোড়ো মাটির তৈরী, ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সম্ভবতঃ মহেঞ্জোদড়োতে এরূপ প্রাচীর ছিল না। হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—একটি বিরাট শস্যের ভাণ্ডার এবং একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ।

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী : সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা বার্লি, গম জাতীয় খাদ্যশস্য, খেজুর ও নানা প্রকার ফলমূল খেত। তারা পশুর দুধ পান করত। এ ছাড়া মাছ, মাংস ও ডিম ছিল তাদের প্রধান আহার্য। এখনকার অধিবাসীরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরতে ভালবাসত। সেগুলি তৈরি হত সোনা-রূপা জাতীয় মূল্যবান ধাতু দিয়ে। অলঙ্কারগুলির মধ্যে তাদের প্রিয় ছিল—হার, দুল, তাগা, চুড়ি, বালা ইত্যাদি। এগুলি সুদৃশ্য ও কারুকার্য-মণ্ডিত ছিল। সুতী ও পশমের নির্মিত বস্ত্র তারা ব্যবহার করত। সুন্দর সুন্দর নক্‌শা-আঁকা বাসন-কোসনের ব্যবহারও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কারিগরি দক্ষতা : সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা কারিগরি বিদ্যায়

পারদশী ছিল। সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত ইত্যাদি দিয়ে তৈরী সুদৃশ্য ও কারুকার্য মণ্ডিত অলঙ্কারগুলিতে তারই পরিচয় মেলে।

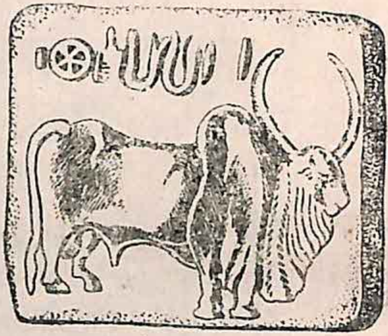


মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীদের অলঙ্কারসমূহ

এ ছাড়া গৃহ-নির্মাণ, সুদৃশ্য চিত্র-বিচিত্র মাটির বাসন নির্মাণ ইত্যাদিতেও তাদের কারিগরি দক্ষতা বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ এখানকার অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত ছিল। স্থলপথে ও জলপথে তাদের ব্যবসা চলত।

ব্যবসায়ীরা নিজেদের মালপত্র মোড়ক করে সীলমোহর লাগিয়ে রাখত। মাটির তলায় এইজাতীয় বহু সীলমোহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তখন বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল জমজমাট। জলপথে নৌকোয় করে এখানকার অধিবাসীরা সুমেরীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। স্থলপথে গরুর গাড়িতে পশ্চিম দিকে বেলুচিস্তানে মাল যেত। কেনা-বেচার জন্য এরা দেশের অভ্যন্তরে বাটখারা ও মাপের গজকাঠি ব্যবহার করত। তামা অথবা ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে টাকা-পয়সার কাজ চলত।



সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহর

উপাস্য দেব-দেবী ঃ সিন্ধু-সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। সেটা থেকে অনুমান করা যায় যে, এখানে শক্তি বা মাতৃকা দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন সীলমোহরে ষাঁড়, সাপ, কুমীর ও গাছের ছবি আছে। এগুলিকে এখানকার অধিবাসীরা খুবই পবিত্র মনে করত। পোড়ামাটির তৈরী লিঙ্গমূর্তি ও শিবের মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে। সেটা থেকে মনে হয়, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা হতেই বোধ হয় এদেশে শিবপূজা ও শৈবধর্মের বিকাশ ঘটে। এখানে একটি অদ্ভুত ধরনের যোগী পুরুষের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিটির তিনটি শিং তার চারদিকে বাঘ, সিংহ, হাতী জাতীয় পশু এবং মূর্তিটি ধ্যানে নিমগ্ন।



সিন্ধুসভ্যতার দেবদেবী

পণ্ডিতদের ধারণা এই মূর্তিটি শিবের পশুপতি মূর্তি। এসব কিছুই তৎকালীন দেব-দেবীকুলে শিবের অসামান্য জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

সমাজ-ব্যবস্থা : পূর্বেই বলা হয়েছে, সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা ছোট ছোট নগরে বাস করত। নগরগুলি ছিল কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রগুলির কোনটিতে হয়ত বা রাজা ছিলেন ; কিন্তু তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রজাদের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করে দেশের শাসনকার্য চালাতেন ও দেশরক্ষা করতেন। পুরোহিত থাকলেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়। প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। এছাড়া ছিল কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, স্থপতি—আরও অনেকে। প্রত্যেকেই সমাজের প্রয়োজনে সাধ্যমত কাজ করত। দেশে তখন ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল। ধনীরা পোড়া ইটের তৈরী দোতলা, তিনতলা পাকা বাড়িতে থাকত। কিন্তু দরিদ্রদের বাসস্থান ছিল ছোটখাট কুটির। অলঙ্কারের জনপ্রিয়তা ছিল, কিন্তু দরিদ্রদের অলঙ্কার ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। ধনীরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। দরিদ্রদের অবস্থা বোধহয় এ-যুগের মতই ছিল দুঃখ-দুর্দশায় ভরা।

সিন্ধুলিপি : সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে কিছু কিছু সংকেত-লিপিও পাওয়া গেছে। মিশরীয় বা সুমেরীয় লিপির মত এগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। সেটা সম্ভব হলে এই প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আরও বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সিন্ধু-সভ্যতার বিনাশ : বাইরের কোন শত্রুর আক্রমণে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা, মহামারী ইত্যাদির ফলে এই সভ্যতার বিনাশ ঘটে।

বোধহয় একাধিক জাতি মিলে এই সিন্ধু-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তাদের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতির ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

চৈনিক সভ্যতা

চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর তীরে চৈনিক প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব। প্রচীনতার দিক হতে এই সভ্যতা বোধহয় পূর্বে

উল্লিখিত সভ্যতাগুলির মতই প্রাচীন—প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। এখানে এক বিচিত্র চিত্রলিপি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের মতে, এই লিপি চিত্রলিপির পর্যায় পার হয়ে এসেছিল। এই লিপিতে ভাবব্যঞ্জক ও ধ্বনিব্যঞ্জক—দু'রকম চিহ্নেরই ব্যবহার ছিল।

হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকা: হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় চীনদেশে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই নদীগুলি বর্ষার জলে পূর্ণ হয়ে উঠত। দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা দেখা দিত। সেই বন্যায় ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বন্যা থেমে গেলে জমিতে পলি পড়ত; আর তাতে ফসল ফলানো সহজ হত। চীনারা এই নদীগুলির প্লাবন রোধ করার জন্যে বাঁধ দিত। সেই বাঁধগুলি ছিল দীর্ঘ ও প্রশস্ত। উর্বর জমিতে কৃষিকার্যের সুবিধে ছিল বলে এখানকার আবহাওয়া ছিল মনোরম ও বাসযোগ্য। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন।

প্রাচীন চীনের সামাজিক জীবনধারা: প্রাচীন চীনারা প্রথমে ছোট ছোট নগরে বাস করত। প্রথমে বিভিন্ন নগররাজ্যে ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রাজা। রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। পরবর্তীকালে সমগ্র চীনদেশ একই রাজার শাসনাধীনে আসে। চীনাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। মাছ ধরা, শিকার-করা, গান-বাজনা ইত্যাদি ছিল তাদের আমোদ-প্রমোদের উপায়। তারা ইটের দ্বারা ইমারত নির্মাণ করতে পারত। খুব সম্ভব তাদের মধ্যে চুম্বকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চিত্রাঙ্কন দক্ষতা, সুদৃশ্য মৃৎপাত্র নির্মাণ, পাথরের ছুরি ও কুঠার তৈরী করা, অথবা হাড় ঘষে তীরের ফলা বানানোতে তারা খুবই পারদর্শী ছিল। চীনে সম্ভবতঃ তামা ও ব্রোঞ্জ জাতীয় ধাতুর ব্যবহার অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে অনেক পরে শুরু হয়েছিল।

পৌরাণিক উপকথা: প্রাচীন চীনারা গল্প বলতে ও গল্প শুনতে খুবই ভালবাসত। সেজন্য তাদের মধ্যে বহু উপকথার প্রচলন ছিল। পৌরাণিক যুগে চীনারা বিভিন্ন সম্রাটের অধীনে নাকি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস

শেখে। কোন সম্রাটের আমলে শিখল পশু শিকার করতে, আবার কোন সম্রাটের আমলে শিখল কাপড় বুনতে এবং পাথরের দ্রব্যাদি নির্মাণ করতে। পৌরাণিক যুগে সেরকম একজন সম্রাটের উল্লেখ মেলে। তিনি ছিলেন চীনের পঞ্চম রাজা সেঙ্‌। তিনিই নাকি জল নিকাশের জন্য বাঁধ নির্মাণ করেন। জঙ্গল সাফ করে, জানোয়ার তাড়িয়ে নগর বসান। এসব গল্পগুলির প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজার ক্ষমতাকে দেবতুল্য বলে প্রচার করা। ফলে কৌশলে রাজার ক্ষমতাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করে স্থায়িত্ব দান করাই ছিল এসব ধর্মীয় উপকথার প্রধান ভিত্তি। কারণ কোন দেশে কোন কালেই রাজা কখনও গৃহ বা নগর-নির্মাণ করেননি। সেটা করেছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের ক্ষমতার চেয়ে রাজার ক্ষমতা কত বড়—সেটা জাহির করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই সব পৌরাণিক উপকথার।।

সভ্যতাগুলির মধ্যকার ঐক্য ঃ পুরা-প্রস্তর যুগ হতে নব্য-প্রস্তর যুগ পার হয়ে প্রাচীন মানুষ পেঁৗচেছে এক বিশেষ পর্যায়ে। এই পর্যায়ের নাম ধাতুর ব্যবহারের যুগ। এই সময়ে মেসোপটেমিয়া, মিশর ভারত ও চীন দেশে উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা সৃষ্টি হয়। এই সব প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে দেশভেদ ছিল, কিন্তু কালভেদ ছিল না। সেজন্য ঐগুলির মধ্যে গভীর ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার পরিণত রূপ ঃ নব্য-প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষির আবিষ্কার করেছে; হয়ত নগরও গড়েছে; কিন্তু উন্নত নাগরিক জীবনধারা গড়ে তুলতে পারে নি। সেটা সম্ভব হয়েছে ধাতু ব্যবহারের যুগে। গৃহ নব্য-প্রস্তর যুগেও তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু পাকা ইমারত, সৌধ বা মন্দির গড়ে ওঠেনি। মিশরের পিরামিডের নির্মাণ কৌশল বা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের সুপরিকল্পিত নাগরিক জীবনধারা নব্য-প্রস্তর যুগে ছিল কল্পনার অতীত। ধাতুর আবিষ্কারই যখন হয়নি, তখন কারিগরি দক্ষতার প্রশ্নই আর আসে না। ধাতু ব্যবহারের যুগে এসেই মানুষ লাভ করল উন্নত কারিগরি দক্ষতা। এ যুগের অস্ত্রশস্ত্র বা সোনার অলঙ্কার নির্মাণের মধ্য দিয়ে সেই দক্ষতারই প্রকাশ। মনের

ভাব প্রকাশের জন্য নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ আকুল হয়েছে। সেই আকুলতার পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম ধাতু ব্যবহারের যুগে এসে। সুমেরীয় লিপি, সিন্ধুলিপি বা মিশরীয় লিপির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ঘটেছে তারই সার্থক রূপায়ণ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য : পূর্বেই বলা হয়েছে—দেশভেদ সত্ত্বেও প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে কালভেদ অতি সামান্য। সেজন্যই পৃথিবীর চার প্রান্তে যে প্রাচীন সভ্যতাগুলির উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার মধ্যে ঐক্য ছিল। কৃষি ও পশুপালন সর্বত্রই প্রধান পেশা ছিল। দেশশাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ছিল রাজার উপরে ন্যস্ত। ধর্মীয় বিধান দিতেন পুরোহিত। সমাজে বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকে রুটি-রুজির সংস্থান করত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি, যানবাহনের আবিষ্কার, ধনী-দরিদ্রের জীবনধারার পার্থক্য—ঐগুলি অর্থনৈতিক জীবনধারার মধ্যকার সঙ্গতি নির্দেশ করে। মিশরের খেয়ালী ফারাওদের মত রাজার মৃত্যুর পরে অমরতার সাঁকো বাঁধতে গিয়ে কত লোককে যে হয়রানি হতে হয়েছে,—সেটা তো আগেই জেনেছ। রাজা এবং ধনীদের বিলাসবহুল জীবনের পাশে দরিদ্রদের দুঃখ-দুর্দশাময় জীবন এযুগ-সেযুগ সব যুগেই ছিল। কৃষির সময় হতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, এ যুগে এসে তা পেল চরমতা ; আর তাতে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়তে লাগল। এই সময়েই উদ্ভব হল ক্রীতদাস প্রথার। গরু-ভেড়ার মত সামান্য রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে মানুষকে দিয়ে পশুর মত খাটিয়ে নেওয়ার উপায় এই সময়েই দেখা দিল। আর তাতে করে যার সম্পদ আছে, সে হল ধনী ; যার কিছুই নেই, সে হল দরিদ্র। এই ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের বৃত্তান্ত নিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষের যথার্থ ইতিহাস।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay-Type Questions) :

১। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাগুলিকে মানব-সভ্যতার প্রভাত বলা হয়েছে কেন? এই সময় কোথায় কোথায় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল?

২। মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কি? এই দেশটিতে প্রাচীনকালে কেমন করে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

৩। সুমেরীয়রা বন্যা প্রতিরোধের জন্যে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল?

৪। সুমেরীয়রা কোন্ বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল?

৫। মিশর দেশটি কোথায়? একে নীলনদের দান বলা হয় কেন?

৬। প্রাচীন মিশরে রাজা ও পুরোহিতদের মর্যাদা কিরূপ ছিল?

৭। মিশরীয় লিপি সম্পর্কে কি জান? প্রাচীন মিশরীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল?

৮। পিরামিড কি? পিরামিড সম্পর্কে যা জান লেখ।

৯। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০। প্রাচীন মিশরীয়দের প্রধান প্রধান পেশা কি কি ছিল?

১১। প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার আদিবাসীদের নাগরিক জীবনধারা সম্পর্কে কি জান?

১২। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৩। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দাও।

১৪। প্রাচীন চীনাদের বাঁধ-নির্মাণ ও সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কে কি জান?

১৫। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে কি কি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type) :

১। সুমেরীয় লিপি সম্পর্কে কি জান?

২। প্রাচীন মিশরে রাজস্ব-সংগ্রাহক ও সৈনিকেরা কি করতেন?

৩। মমি কি? প্রাচীন মিশরীয়রা কিভাবে মমি সংরক্ষণ করত?

৪। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের প্রধান উপাস্য দেব-দেবীদের সম্পর্কে কি জান?

৫। প্রাচীন চীনের ধর্মীয় উপকথায় বাঁধ দেওয়ার কাহিনী বিশ্বাস করা যায় না কেন?

৬। প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে কোন্ কোন্ দিক হতে সভ্যতার পরিণত রূপ বলা হয়েছে?

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

১। **মুখে মুখে উত্তর দাও :**

(ক) মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? (খ) আফ্রিকা মহাদেশের কোথায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে? (গ) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার স্রষ্টা কোন্ জাতি? (ঘ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন? (ঙ) হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সিকিয়াং নদী দুইটি কোথায় অবস্থিত? (চ) হায়রোগ্লিফিক্‌স কি? (ছ) মিশরের রাজার উপাধি কি ছিল? (জ) প্রাচীন সভ্য-জাতিগুলি জলপথে বাণিজ্য চালাত কেমন করে? (ঝ) পশুপতি শিবের মূর্তি কোথায় পাওয়া গেছে? (ঞ) কোথায় শৈবধর্মের বিকাশ ঘটে? (ট) মিশরের দেব-দেবীর আকার কেমন ছিল?

২। **ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ :**

(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম হল তুরস্ক। (খ) মহেঞ্জোদড়ো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সিন্ধুদেশে অবস্থিত। (গ) সুমেরীয়দের মধ্যে সৈনিকেরা ধর্ম-কর্ম চালাতেন। (ঘ) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। (ঙ) সিন্ধু উপত্যকার রাজারা নিজেদের কীর্তিকে অমর করার জন্য পিরামিড নির্মাণ করাতেন।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল — ও —। (খ) ধাতুর ব্যবহার শুরু হবার পরে — পদ্ধতির এল —। (গ) অতীতে যার নাম ছিল — বর্তমানে তারই নাম ইরাক। (ঘ) সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তাদের — লিপি বা — লিপি। — বলা হয় — নদের দান। (ঙ) — তৈরি — নামে একপ্রকার কাগজে মিশরীয়রা লিখিত। (চ) সিন্ধু — ছিল —।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ ব্যবহারকারী মানব সমাজ ঃ প্রাচীন সভ্যতার জয়যাত্রা

তামা আর ব্রোঞ্জের আবিষ্কার করেই প্রাচীন মানুষ থেমে থাকেনি ; আরও নতুন কিছু আবিষ্কার করে জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর তারই ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে সোনা-রূপার মত ধাতুর। লোহার আবিষ্কার হয়েছে সবার শেষে। কারও কারও মতে, মিশরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে আকরিক লোহার ব্যবহার ছিল। সেটা পাওয়া গেলেও মনে হয় প্রাচীন মিশরীয় সভাতার সূচনা পর্বে লোহার প্রচলন ছিল না। সেটা আরও পরবর্তীকালে ঘটেছে। এশিয়া-মাইনরে প্রথম লোহার আবিষ্কার হয়। লোহার আবিষ্কার প্রাচীন যুগের মানুষের জীবনে আনে বিরাট পরিবর্তন।

লোহার আবিষ্কার ও তার প্রতিক্রিয়া ঃ লোহার প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল এশিয়া মাইনরে। পরবর্তীকালে অন্যত্র এই ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হয়। ধাতু হিসাবে লোহা যে কি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বুঝিয়ে বলার কিছুই নেই। চোখ মেললেই তোমরা দেখতে পাও—চাষী চাষ করে যে লাঙল দিয়ে, তাতে লোহা আছে। ছুরি, কাঁচি, কোদাল—এসব কিছুই লোহার তৈরি। লোহা ভারী ও মজবুত এবং শান দিয়ে একে ধারালো করে তোলা সম্ভব। সেজন্য লোহার আবিষ্কারের ফলে সামাজিক দিক থেকে ঘটল বিরাট একটা পরিবর্তন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ লোহার ব্যবহার শুরু হবার পরে সমাজে একদল লোক লোহা দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নির্মাণে নিযুক্ত হল। চাষবাসের ক্ষেত্রে লোহার শাবল, ফল-আনাজপত্র ও মাছ-মাংস কাটার জন্য এই সময় থেকে ছুরি, বঁটির

ব্যবহার শুরু হয়। কাপড় কাটার জন্য কাঁচির প্রচলন হয়। এভাবে লোহার তৈরী পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক লোহার তৈরী দ্রব্য নির্মাণেই নিযুক্ত রইল। এরাই পরবর্তী কালে কামার রূপে পরিচিত হয়।

রাজকীয় ক্ষমতার প্রসার ঃ লোহার ব্যবহার শুরু হবার পরে রাজারা লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করায় গুরুত্ব দিলেন। যে রাজার হাতে যত অস্ত্র থাকত—তিনি তত ক্ষমতার প্রসার সাধন করতে লাগলেন। নতুন ধরণের লোহার অস্ত্রের সাহায্যে রাজারা নতুন রাজ্য জয় করে প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণে লোহার থাম দিয়ে তাকে দৃঢ় মজবুত করে তোলা হল। লোহার ফটক নির্মিত হতে লাগল।

পঞ্চম অধ্যায় — প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলন, মিশর, ইরান ও ইহুদী জাতি ঃ লৌহ-যুগের সভ্যতার আদিপর্ব

লোহার ব্যবহার শুরু হবার পরে ইতিহাসে নতুন করে পালা বদল ঘটল। একদল ছন্নছাড়া ভবঘুরে যাযাবরের দল দেশ হতে দেশান্তরে পাড়ি দিতে লাগল। এরা ছিল পার্বত্য অঞ্চল অথবা মরু প্রদেশের বাসিন্দা। আর ওদের পেশা ছিল পশুপালন। পশুচারণের উপযুক্ত ভূমির সন্ধানেই এরা নদীর তটভূমিতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার পুরনো বাসিন্দাদের যুদ্ধে পরাজিত করে সেখানে বসবাস করতে থাকে এবং প্রাচীন সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসে। তারপর ধীরে ধীরে এদের জীবনধারায় দেখা দেয় নানা পরিবর্তন। ওরা গড়ে তোলে নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি। অস্ত্র হাতে নিয়ে ওরা দেশ-দেশান্তরে নতুন রাজ্য জয়ের নেশায় ছুটে চলে। এভাবেই গড়ে ওঠে নতুন নতুন সাম্রাজ্য, নতুন নতুন নগরী আর নতুনতর জীবনধারা। আমরা এ অধ্যায়ের

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সেই ক্রমবিকশিত সুসভ্য মানব-সমাজের বিচিত্র জীবন-ধারার পরিচয় জানার চেষ্টা করব।

(১) **ব্যাবিলন**ঃ প্রাচীন সুমেরীয় জাতি এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ল। একদিন তারাই গড়ে তুলেছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। এদের দুর্বলতার সুযোগে সেমিটিক নামে যাযাবর জাতির একটি শাখা এখানে এসে হানা দিল। ওরা সুমেরীয়দের পরাজিত করল। ব্যাবিলন নামে এক নগর গড়ে তুলল ; আর এই ব্যাবিলন নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক নতুন সভ্যতা। **আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলন নগরকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল—সে সভ্যতাই ব্যাবিলনীয় সভ্যতা** নামে পরিচিত। যাযাবর সেমিটিকরা উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী সুমেরীয়দের কাছ থেকে শিখল। ওরা পূর্বের যাযাবর জীবন ত্যাগ করল। পরবর্তীকালে এই ব্যাবিলন নগরীর অধি-বাসীরা মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে রেখে গেল তাদের নতুন সভ্যতার অতুলনীয় অবদান। ধীরে ধীরে পশুপালন ছেড়ে এরা কৃষিকার্যকেই প্রধান পেশা হিসাবে বেছে নিল। এখানকার উর্বর জমিতে প্রচুর ফসল, আনাজপত্র ও ফল ফলত। সেজন্য এখানকার কৃষকদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। তাই ওরা উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজাকে রাজস্ব দিত। ওরা চাষবাসের উন্নতির দিকেও খুব বেশি নজর দিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যঃ ব্যাবিলন নগরীর অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। ওরা জলপথে সুদূর ভারতবর্ষ আর মিশরের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। ব্যবসায়ীরা সমাজে বিশেষ মর্যাদা পেত। তারা দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারত। এখানে প্রচুর খাদ্যশস্য, ফল ও আনাজপত্র জন্মাত। শস্য-সম্পদের বিনিময়ে ব্যবসায়ীরা অন্য দেশ থেকে মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করত।

মন্দির পুরোহিতঃ ব্যাবিলনবাসী সুমেরীয়দের মত পোড়ামাটির তৈরী ইট দিয়ে সুন্দর সুন্দর সৌধ ও গৃহনির্মাণ করত। ব্যাবিলনের 'উর' নগরীতে খননকার্যের ফলে এই প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন

আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার গৃহ ও মন্দিরগুলো বিভিন্ন ধরনের ছিল। উর নগরীর দেবতা ছিলেন ন্যানার। তিনি ছিলেন চাঁদের দেবতা। দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মারডাক। এই দেবতা জিগুরাট নামক মন্দিরে থাকতেন। ২৮৮ ফুট উঁচু এই দেবতার মন্দিরটি। দেখতে একটি ছোট পাহাড়ের মত। এতে অনেকগুলি ধাপ ছিল। উর, সুমের এবং অন্যান্য বহু নগরে এই জাতীয় আরও বহু সৌধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যাবিলন নগরীর অধীনে ছোট ছোট নগরীর ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। এই সব মন্দিরে পুরোহিত থাকতেন। তাঁরা ধর্মীয় ব্যাপার সম্পাদন করতেন। পুরোহিতেরা নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চা করে অবসর সময় কাটাতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : সুমেরীয়দের সংস্পর্শে এসে ব্যাবিলনবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়। এখানে ব্যাপকভাবে জ্ঞানচর্চা চলত। সূর্যের ছায়ার ওপর নির্ভর করে সূর্যঘড়ি ও জলঘড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা প্রথম এই ব্যাবিলনবাসীর মাথাতেই এসেছিল। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় এদের পারদর্শিতা ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে এরা ভাগ্য নির্ণয় করত। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমা করে। ৩৬৫ দিনে এক বৎসর গণনা করা হয়। এসব বিষয় ব্যাবিলনের পণ্ডিতদের মাথাতেই প্রথম এসেছিল।

হামুরাবির কোড বা আইন : ব্যাবিলন নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। তিনি সুমেরীয়দের কাছ থেকে বহু নগর জয় করেন। যেমন তিনি ছিলেন যুদ্ধজয়ী, তেমনি ছিলেন সুশাসক। তিনি প্রজাদের সুশাসনের জন্য ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের অধীনে বিভিন্ন নগরে প্রচলিত আইনগুলির সার-সংকলন করেন। তাকে বলা হয়—হামুরাবির কোড ও আইন। এতে প্রত্যেকের ন্যায়-বিচার পাওয়া, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা, ধনী ও দরিদ্রকে আইনের চোখে সমান মনে করা ক্রীতদাসদের বাঁচার মত মজুরি পাওয়া এবং আইনের চোখে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার অর্জন ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

হামুরাবির কোডে নির্দেশিত সমাজ-ব্যবস্থা : আজ হতে প্রায়

চার হাজার বছর আগে হামুরাবির কোড রচিত হয়। এতে এক উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠনের ইঙ্গিত মেলে। আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার, ন্যায়বিচার লাভ, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ—সব-কিছুই আধুনিক সমাজে গুরুত্ব পেয়েছে। সেযুগে ক্রীতদাস প্রথা

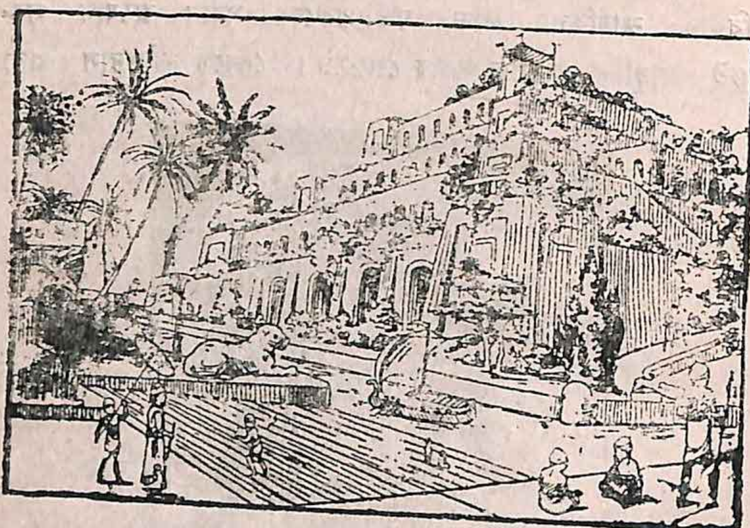


হামুরাবি

ছিল—এ যুগে তা নেই। তবে খেটে-খাওয়া মানুষ ন্যায্য মজুরি হতে বঞ্চিত ছিল। তখন আইন কঠোর ছিল। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাতেও এগুলি বিশেষ মর্যাদা পায়। সেজন্য চার সহস্র বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও হামুরাবির কোডের উপযোগিতা আজও সমানভাবে অক্ষুণ্ণ আছে।

হামিরাবির রাজত্বের বেশ কিছুকাল পরে দুর্ধর্ষ আসীরীয় জাতি কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকৃত হয়। এই আসীরীয় জাতি আর এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। পরে চ্যালডিয়ানেরা আসীরীয়দের পরাজিত

করে। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান—নেবুকাডনেজার নামে এই নগরীর একজন চ্যালডিয়ান রাজার এটি এক অমরকীর্তি।



ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

(২) **মিশরের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা**ঃ প্রাচীন সভ্য মিশর, উন্নত মিশর, সমৃদ্ধ মিশর—একদিন এমন সভ্যতা গড়েছিল, যে সভ্যতা আজও আমাদের মনে বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর কৌতূহল জাগায়। ভাবলে অবাক লাগে—সেই মিশর একদিন অবতীর্ণ হল সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায়। নতুন দেশ জয়ের নেশা পেয়ে বসল স্বৈরাচারী ফারাওদের। শান্তিপ্রিয় ঘরমুখী মিশর পেল নতুন যুদ্ধের স্বাদ।

হিক্‌সস্‌ নামে দুর্ধর্ষ এক যাযাবর জাতি ঘোড়ার রথে চেপে হঠাৎ মিশরে এসে হানা দিল। "হিকসস্‌ শব্দের অর্থ—মেষপালক। ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে সেই যাযাবর হিকসস্‌রা সহজেই মিশর জয় করল। তাতে বেশ কিছুদিন মিশরীরা পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য হল। প্রথম ধাক্কায় পরাজিত হলেও কয়েকজন মিশরবাসী ফারাও দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে সুশিক্ষিত সৈন্যদল গঠন করেন। পরে তাঁরা যুদ্ধ-কৌশলে ঘৃণিত হিকসস্‌দের সহজেই পরাজিত করেন। যুদ্ধে অনেক হিক্‌সস্‌ প্রাণ দেয়; আবার অনেকে ধরা পড়ে ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

তারপর ফারাওরা অপমানের জ্বালা জুড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়েন সাম্রাজ্য স্থাপনে। বিজয়ী ফারাওগণ হিকসস্‌দের দেশ সীরিয়া ও প্যালেস্টাইনে অভিযান চালিয়ে সহজেই তা জয় করে নেন। তখন এশিয়ার ভূখণ্ডে কোন শক্তিমান জাতি বা রাজা ছিল না। তাই পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে ফারাওগণ নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।



ফারাও

নতুন সাম্রাজ্য বিজেতা ফারাওদের মধ্যে **তৃতীয় থাটমস্‌** ছিলেন সবচেয়ে পরাক্রান্ত। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রথমে এশিয়ায় ও পরে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিশিয় ও আরব নগরীগুলিকে জয় করেন। এভাবে গড়ে ওঠে নতুন নতুন মিশরীয় উপনিবেশ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের উত্থানের ফলে মিশরবাসী স্বাধীনতা হারায় এবং তাদের উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যায়। এভাবে ফারাওদের দুর্বলতা পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

পুরোহিতদের প্রাধান্য ঃ সাম্রাজ্যবিস্তারে অবতীর্ণ হবার আগে ফারাওগণ দৈবাদেশ শোনার জন্য মন্দিরে যেতেন। পুরোহিতেরা যেমন—তেমন করে একটা কিছু ফারাওদের বুঝিয়ে দিতেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে পুরোহিতদের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফারাওদের দুর্বলতা, অপদার্থতা ও বিলাসবহুল জীবনের আসল স্বরূপটা পুরোহিতদের কাছে অজানা ছিল না। মন্দির থেকে তাঁরা শিক্ষাদান কার্যেও লিপ্ত থাকতেন। সেজন্যই ধীরে ধীরে পুরোহিতেরা খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ফারাওদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করেন। সেজন্য ফারাওরা ধীরে ধীরে তাঁদের অনুগত হয়ে ওঠেন। এভাবে ধর্মজীবন থেকে পুরোহিতদের রাজনৈতিক জীবনধারাতেও অনুপ্রবেশ এই সময়

হলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। তা ছাড়া সদ্য-বিজিত উপনিবেশগুলির শাসনকর্তা এই পুরোহিতদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হতেন।

ইরান : ইরানীরা প্রাচীন আর্য জাতির এক শাখা। এদের বাসস্থান ছিল মরুময় ও পাহাড় ঘেরা একটি অঞ্চল। পাহাড়ের নীচে ছিল অনুর্বর ভূমি। এরা সেখানে কঠোর পরিশ্রম করে চাষবাস করত এবং আনাজ, খাদ্যশস্যও ফলাত। পরে এই ইরানীদের একদল পারস্যে আসে এবং সেখানে বাস করতে শুরু করে। প্রাচীন আর্যভাষা এদের হাতে পেল নতুন রূপ—যার নাম **ফার্সী** বা **পারসিক** ভাষা।

পারস্যের উত্থান : ইরান দেশটি আগে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। একে একে আসীরিয়া, চ্যালডিয়ান, মিডিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পতনের পরে পারসিকরা খুবই পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। **সাইরাস** নামে একজন রাজা পারসিকদের সংগঠিত করে একটি একক জাতিতে পরিণত করেন। তিনি তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে এশিয়া-মাইনর, আসীরিয়া ও ব্যাবিলন জয় করেন। সাইরাসের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ **একিমিনিড বংশ** নামে খ্যাত।

সাইরাসের পরে এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন প্রথম **দারায়ুস**। তাঁর সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের তীর হতে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্সোপোলিস নামে নগরীতে ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ। এই রাজপ্রাসাদের গঠনরীতিতে উন্নত পারসিক শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় মেলে। খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগে দারায়ুসের সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যদল ম্যারাথনের রণপ্রান্তরে গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়। মনের দুঃখে দারায়ুস প্রাণ হারান।

দারায়ুসের পরে **জেরাক্সাস** পারস্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি থার্মোপলি গিরিপ্রান্তরের যুদ্ধে গ্রীকদের পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল সালামিসে ও প্লেটিয়াতে এথেন্সের সুশিক্ষিত নৌ-বাহিনীর কাছে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এরপরে এই বংশের আর একজন উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন তৃতীয়

দারায়ুস। তিনি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজিত হন। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশই গ্রীকদের দখলে চলে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পারসিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে।

জরথুস্ট্র ঃ ইরানীরা প্রথমে ভারতীয় আর্যদের মত বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইরানীদের মধ্যে **জরথুস্ট্র** নামে একজন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়। তিনি এক নতুন ধর্মের পথ-নির্দেশ করেন। তিনি বলেন—সর্বদা ভাল আর মন্দের মধ্যে চলছে সংঘাত। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন মাত্র দেবতা আছেন, তিনি হলেন **'আহুরা-মাজদা'**। তিনি আলো ও স্বর্গের দেবতা। তাঁর অধীনে আছেন বহু অনুচর। 'আহরমন' হলেন অপদেবতা। এই অপদেবতা আহরমনের সঙ্গে চলছে 'আহুরা-মাজদা'র অবিরত সংগ্রাম —সত্য ও ন্যায়ের জয় সুনিশ্চিত।

জরথুস্ট্রের বাণী যে গ্রন্থে সংকলিত আছে, তার নাম **আবেস্তা** বা **অবেস্তা**। এই গ্রন্থটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। জরথুস্ট্র অগ্নি-উপাসনার প্রবর্তন করেন। কারণ ইরানীদের ধারণা ছিল আগুনে সমস্ত পাপ পুড়ে যায় এবং সত্যের আলো জ্বলে ওঠে। তাই ভারতীয় আর্যদের মত ইরানীদের যজ্ঞে ও পূজায় আগুন না হলে চলত না। ইরানীরা মৃতদেহ পোড়াতও না, কবরও দিত না। তারা একটা খোলা জায়গায় শবদেহ রেগে দিত। সেটা কুকুর ও শকুনিকে দিয়ে খাওয়াত। তাদের ধারণা ছিল যে, দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে এটাই করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষে—বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলে এখনও ইরানীদের একটি শাখা বাস করে। তাদের বলা হয় পার্সী। এরা জরথুস্ট্রের ধর্মীয় পথনির্দেশ মেনে চলে এবং আবেস্তায় বিশ্বাস করে। জরথুস্ট্রের মৃত্যুর কয়েক শ' বছরের মধ্যেই তাঁর প্রচারিত ধর্মমত লোপ পেয়ে যায়।

(৪) **ইহুদী জাতি ঃ** ইহুদীরা ছিল এক যাযাবর জাতি। মরুময় আরবদেশে ছিল এদের আদি বাসস্থান। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল

পশুপালন। তারা পশুচারণের উপযোগী ভূমির সন্ধানে দলপতি আব্রাহামের নেতৃত্বে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পৌঁছায় প্যালেস্টাইনে। সেখানকার জমি উর্বর। সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মাত। সেজন্য ওরা সেখানেই বসতি গড়ে তোলে। ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশা ভরা কাহিনী ওল্ড টেস্টামেণ্টে (বাইবেলের পুরনো অনুশাসন কাহিনীতে) বর্ণিত আছে।

মিশরে ইহুদী জাতি ঃ হিকসস্‌দের আমলে ইহুদীদের একটি দল মিশরে পৌঁছায় ও সেখানে বাস করতে থাকে। পরে সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ফারাওরা তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে, ক্রীতদাসদের জীবন যাপনে বাধ্য করে। মোজেস নামে একজন সুদক্ষ সংগঠক ইহুদীদের মধ্যে আনেন নতুন প্রেরণা, নতুন উৎসাহ ; আর তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইহুদীরা জেগে ওঠে। মিশরে এই সময়ে ভয়াবহ প্লেগ রোগ মহামারী আকারে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেক পরিবারের বয়স্করা মারা যেতে থাকে। এই অবস্থায় ফারাওদের ধারণা হয়, দেবতা বোধহয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাই তাঁরা ভয়ে ভয়ে বন্দী ইহুদীদের ছেড়ে দেন। তখন মোজেস নামে এক ব্যক্তি ইহুদীদের সংগঠিত করেন এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা সঞ্চারিত করে তোলেন। মোজেসের সুগঠিত নেতৃত্বে ইহুদীরা ক্রীতদাস জীবন হতে মুক্তি পায়।



মোজেস

মোজেস ঃ মোজেস ইহুদীদের নিয়ে চলেন বহু দূরদেশে। বেশ কয়েক বছর ধরে ইহুদীরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। অবশেষে এসে পৌঁছায় দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের ক্যানন রাজ্যে। ইহুদীদের ক্রীতদাসত্ব হতে মুক্তি এবং নতুন জীবনধারায়

অভ্যস্ত হবার মূলে মোজেসই ছিলেন ইহুদীদের পথদ্রষ্টা। তাঁর আদর্শকে ইহুদীরা পবিত্র বলে মনে করে। এ কারণে তারা মোজেসকে ধর্মগুরুর মতই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সেজন্য মোজেসের দশটি প্রধান বাণীকে তারা পাথরের লিপিতে খোদাই করে রেখেছে। মোজেস ইহুদীদের জীবনে যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। মোজেস যীহোবা নামে এক দেবতার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। সব মানুষকে ভালবাসতে এবং অনুতপ্ত পাপীকেও ক্ষমা করতে বলেছেন। ইহুদীদের ধারণা মোজেস অমর। যখনই পাপ ও অন্যায় বাড়বে, ত্রাণকর্তারূপে মোজেস পৃথিবীতে জন্মে ইহুদীদের উদ্ধার করবেন।

ক্রীতদাসত্ব হতে মুক্তির পরে ঃ

ইহুদীরা প্রথমে কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ চলত। বহু বছরের ব্যবধানে প্রথমে সল ও পরে ডেভিড নামে দুই ব্যক্তির অধীনে ছোট ছোট রাজ্যগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে ও নতুন রাজ্য স্থাপন করে। ডেভিড হন সেই রাজ্যের প্রথম সুদক্ষ রাজা। তাঁর রাজধানী হয় জেরুজালেম। এরপর তিনি গোটা প্যালেস্টাইন ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশ (বর্তমান সিরিয়া) জয় করে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

সলোমন ঃ ডেভিডের মৃত্যুর পরে সলোমন জেরুজালেমের সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকালে ইহুদীরা ক্ষমতার সর্বোচ্চ গৌরবের শিখরে উঠে। সলোমন জ্ঞানী ও সুবিচারক ছিলেন। তাঁর শাসনে জেরুজালেম ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে। মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হয়।

সলোমন ছিলেন ন্যায়-বিচারক ও জ্ঞানী সম্রাট। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেন। নতুন নতুন সৌধ ও ইমারত নির্মাণে উৎসাহ দেখান। এতে প্রজাদের

ওপর করের বোঝা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য রাজত্বের শেষ দিকে সলোমন ধীরে ধীরে তাঁর জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। সলোমনের মৃত্যুর পরে ইহুদীদের জীবনে আবার দুর্দশা ঘনিয়ে আসে। আবার তারা ব্যাবিলনের অধীনে ঘৃণ্য দাসজীবন যাপনে বাধ্য হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)

১। লোহার আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দিক হতে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

২। ব্যাবিলনের সভ্যতা বলতে কি বোঝ? ব্যাবিলনবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৩। হামুরাবির কোড কি? তাতে কি কি নির্দেশ আছে?

৪। মিশরের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা সম্পর্কে যা জান লেখ। সেখানে পুরোহিতদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন?

৫। পারস্যের উত্থান সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৬। জরথুষ্ট্র কে? তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

৭। মোজেস কে? ইহুদীরা কেন তাঁকে ধর্মীয় পথদ্রষ্টা রূপে মনে করত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। ব্যাবিলনের মন্দির নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে কি জান?

২। ইরানীদের সম্বন্ধে যা জান কম কথায় লেখ।

৩। ডেভিড ও সলোমনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type)

১। মুখে মুখে উত্তর দাও:

(ক) ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়েছিল কোন্ জাতি? (খ) মারডাক

ছিলেন ? (ঙ) সূর্যঘড়ি কোন্ জাতির সৃষ্টি ? (চ) আহুর-মাজদা কে ? (ছ) আবেস্তা কি ? (জ) পার্সী কাদের বলে ? (ঝ) ইহুদীদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ? (ঞ) যীহোভা কে ?

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) — মহাদেশেই প্রথম লোহার — হয়। (খ) আজ হতে প্রায় — হাজার বছর আগে — কোড রচিত। (— নামে — জাতিরগ) এক শাখা হঠাৎ করে মিশরে এসে হানা দিল। (ঘ) — প্রথমে ভারতীয় আর্যদের মত বহু দেব-দেবীর — বিশ্বাসী ছিল। (ঙ) — ছিল এক যাযাবর জাতি। মরুময় — ছিল এদের আদি বাসস্থান।

৩। **সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করে এই চিহ্ন দিয়ে (✓) দেখাও ঃ**

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ব্যাবিলনের সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল কোন্ জাতি ?	(আর্য/সুমেরীয়/সেমিটিক)
(খ) তৃতীয় থুটমাস কোথাকার রাজা ছিলেন ?	(ইরান/পারস্য/মিশর)
(গ) ইহুদীদের দেবতার নাম কি ছিল ?	(আহুর-মাজদা/মারডাক/ যীহোভা)

———

পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	প্রাচীন সভ্যতার জয়যাত্রার নতুন পর্যায় : গ্রীস দেশ

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীস দেশ। এর পূর্বে ঈজিয়ান সাগর ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস গ্রীসদেশ। শুধু ইউরোপে নয়, সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারেও এই



ইজিয়ান অঞ্চল

গ্রীক জাতির অবদান অসামান্য। সৌন্দর্যবোধ, যুক্তিবাদ এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা—এই গ্রীসবাসীই প্রথম বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিল।

ছোট ছোট পাহাড়-পর্বত চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে—তারই মাঝখানে ছোট ছোট নগরে গ্রীকেরা একদিন বসতি গড়ে তুলেছিল। এরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষা-গোষ্ঠীর একটি শাখা। প্রথমে এরা ছিল যাযাবর। অন্যান্য যাযাবর জাতির মতই এরা ঘুরতে ঘুরতে ঈজিয়ান সাগরের উপকূলে এসে আস্তানা গড়ে তোলে। সেখানকার পুরনো বাসিন্দাদের যুদ্ধে পরাজিত করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে দেয় এবং ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

চার হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপকে কেন্দ্র করে একদিন এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা। ক্রীটীয় সভ্যতা গ্রীসদেশে ব্যাপক

প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রীট-সভ্যতার মানুষ নৌ-বিদ্যা, শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি—সব দিকেই উন্নত ছিল। তারা সুন্দর সুন্দর নগর গড়ে তুলেছিল। ক্রীটের রাজধানী নোসাস সেই আমলের একটি বিখ্যাত নগরী। খননকার্যের ফলে নোসাস নগরীর সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎ-পাত্র, গজদন্ত ও ধাতুর তৈরী ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গেছে। উত্তর দিক থেকে গ্রীকেরা এসে ক্রীট দখল ও বিধ্বস্ত করে দেয়। তথাপি ক্রীট দ্বীপের উন্নত সভ্যতার প্রভাব থেকে গ্রীকেরা মুক্ত হতে পারেনি। পণ্ডিতদের ধারণা, ক্রীটের এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রীক-সভ্যতা প্রভাবিত। কারণ এই দুই প্রাচীন সভ্যতার শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অনেক মিল আছে।

হোমারের যুগ ঃ আমাদের দেশের বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের মত হোমার ছিলেন গ্রীসদেশের একজন মহাকবি। তিনি **ইলিয়াড** ও **ওডিসি** নামে দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন। খুব সম্ভব প্রাচীন গ্রীকেরা ছড়া কাটতে ও বীরত্বের গাঁথা শুনতে ভালবাসত। সেই সব বীরত্বের কাহিনীগুলিই সংকলিত করে হোমার তাঁর মহাকাব্য দুটি রচনা করেন। প্রাচীন গ্রীস দেশের নগর-রাজ্যগুলির মধ্যকার বিরোধের ঘটনাই হোমারের লেখা কাব্য দুটির বিষয়বস্তু। স্পার্টা ও ট্রয় নগরীর সংঘর্ষের কাহিনী ইলিয়াডে বর্ণিত আছে। ওডিসিতে আছে—ইউলিসিস নামে এক দুঃসাহসী বীরের রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী। ইলিয়াড-অডিসি প্রকৃতপক্ষে গ্রীকজাতির বীরত্ব গাঁথা। সেজন্য এ দুটি কাব্যের রচনাকালকে অনেকে **বীরযুগ** আখ্যা দিয়েছেন। আর এক দিক থেকে হোমারের নামানুসারে এ যুগকে বলা হয় – **হোমারের যুগ**।



মহাকবি হোমার

নগররাষ্ট্র, সংস্কৃতি-বিনিময় ও উপনিবেশ ঃ গ্রীকেরা প্রথমে গ্রামে বাস করত। কৃষিকার্য ও পশুপালন করে তাদের দিন কাটত। পরে তারা ছোট ছোট নগর গড়ে তোলে। নগরগুলি ক্রমশঃ এক-একটি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভৌগোলিক ব্যবধান এসব নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ আনে। অন্যদিকে কোন কোন রাজ্যের সঙ্গে গড়ে ওঠে মৈত্রী ও বন্ধুত্ব। তারপর চলে সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়। গ্রীকেরা অলিম্পিয়া পাহাড়ের কাছে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করত। তাতে গ্রীসের সকল নগররাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যোগ দিত এবং এর মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে উঠত। সকল গ্রীকই নিজেকে হেলেনের বংশধর ভাবত ও গ্রীক ভাষায় কথা বলত। হোমারের ইলিয়াড-ওডিসির বীরদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী পাঠ করে সকল গ্রীকবাসীই গর্ব ও আনন্দ বোধ করত।

গ্রীসদেশের শক্তিমান নগররাষ্ট্রগুলি ইজিয়ান উপকূল এবং ইটালীর দক্ষিণে বহু নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। নতুন উপনিবেশগুলোতে চলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার। এভাবেই এই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বহু দূর-দূরান্তরে।

এথেন্স ও স্পার্টা ঃ গ্রীসদেশে অনেকগুলো নগররাষ্ট্র ছিল ; যেমন—এথেন্স, স্পার্টা, ট্রয়, করিন্থ, থিবস ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্সের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। এরাই ছিল গ্রীকদের নেতা এবং যত বাদ-প্রতিবাদের মূলে। এদের প্রভাবে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত। সেজন্য স্পার্টা ও এথেন্সের ইতিহাস বিশেষভাবে জানা দরকার।

স্পার্টার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ স্পার্টাতে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় ভরা ছিল নাগরিকদের জীবন। সেখানে আমোদ-ফুর্তির সুযোগ ছিল না। স্পার্টায় ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল বেশি। খুব সম্ভব খ্রীষ্ট-পূর্ব নবম শতকে এখানকার আদি-বাসিন্দাদের পরাজিত করে এরা ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। এই সব ক্রীতদাসেরা যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে, সেজন্য **লাইকারগাস** নামে একজন আইনজ্ঞ স্পার্টাতে জঙ্গী সামরিক শাসন চালু করেন। এখানে সাত বৎসর বয়স হতে

শিশুদের সামরিক নিবাসে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে সাধারণ শিক্ষা ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল সামরিক শিক্ষা। অস্ত্রচালনা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্যগঠন, আরও কত কি! এখানকার মেয়েদেরও স্বাস্থ্যগঠনের জন্য ব্যায়াম করতে হত। এমনিভাবে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে স্পার্টানরা স্থলযুদ্ধে অপরাজেয় হয়ে ওঠে। গোটা দক্ষিণ গ্রীসে এদের প্রভূত্ব স্থাপিত হয়।

এখানকার অর্থনৈতিক জীবনে ছিল নিদারুণ বৈষম্য। ক্রীতদাসদের জীবন ছিল চরম দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। তারা চাষ ও পশুপালন করত, কিন্তু তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। খেতে না পেলেও এরা টু শব্দটিও করত না। বিদেশীদেরও স্পার্টায় বিশেষ আমল দেওয়া হত না। একে অন্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলত না।

এথেন্স: মুক্ত মন, উদার চিন্তা এবং উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এথেন্সবাসী পৃথিবীর ইতিহাসে অমরতা লাভ করেছে। এখানকার নাগরিকেরা ছিল স্বাধীন ও সুখী। এরা সীমাবদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকত না; বিভিন্ন বিষয়ে এদের ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা চলত। এরা ছবি-আঁকা, নাচ-গান, নাটক-অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মনের আনন্দ ও ফুর্তির রসদ সংগ্রহ করত।

এথেন্স জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। দেশের সকল নাগরিক মিলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করে, আলাপ আলোচনা চালিয়ে দেশ-শাসন করত। দেশের ঐরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরোক্ষ রূপ এখনও পৃথিবীর বহু দেশে অনুসরণ করা হয়। স্বাস্থ্যগঠন, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য—এথেন্সবাসীর মধ্যেও ছিল। তেইশ বছরের পরে যুবকেরা নাগরিক হয়ে দেশের শাসনকার্যে অংশ নিত। ক্রীতদাস, নারী ও বিদেশীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

এথেন্সে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। ক্রীতদাসেরা মজুরি পেত ও অল্পস্বল্প সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ভাল কাজ করলে নাগরিক অধিকারও তারা পেয়ে যেত। দেশে রাজা ছিল না। প্রত্যেক প্রজা ছিল স্বাধীন ও সুখী। এথেন্সে নাগরিকেরা চাষবাস অথবা রূপার খনির কাজে তদারকি করত। প্রত্যেক নাগরিকই ন্যায়বিচার পেত। এমনকি ক্রীতদাসেরাও অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের দ্বারা অত্যাচারিত হলে, ন্যায়-বিচার পাওয়ার জন্য আদালতে প্রার্থনা জানাতে পারত।

স্পার্টা ও এথেন্সের পার্থক্য : স্পার্টার সামরিকতন্ত্র বর্তমানে পৃথিবীতে অচল। নিয়ম-শৃঙ্খলা বা সৈনিক-সুলভ দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রয়োজন আছে সত্য ; কিন্তু সেটাই সব-কিছু নয়। মানুষের জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা আমোদ-প্রমোদেরও দরকার। পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠনের জন্য এ-সব কিছুই চাই। স্পার্টানরা অসম্পূর্ণ মানুষ গঠনের চেষ্টা করেছিল ; তাই শেষ পর্যন্ত তারা সে প্রচেষ্টায় সফল হয় নি। এথেন্সের সাধনা ছিল পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠনের সাধনা। সে সাধনা করেছিল বলেই তো তারা কালজয়ী হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে ওরা ভুলে যায় নি নিয়মানুগত্যের কথা, দেশ-প্রেমের কথা, আর দেশরক্ষার কথা। এথেন্সবাসীর বহুমুখী বিকাশই তাদের প্রাচীন ইতিহাসে অমরতা দান করেছে। আজও গণতন্ত্রের কথা উঠলে বারবার এথেন্সবাসীর উল্লেখ না করে পারা যায় না।

এথেন্স সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির পর্ব : স্পার্টাতে ছাঁচে-গড়া সৈনিক তৈরির জন্য শিক্ষা-দীক্ষা সব-কিছুই পরিচালিত হয়েছিল। এথেন্সে সৈনিক তৈরির কারখানা গড়ে ওঠেনি বলে তারা অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারই খাচ্ছিল—একথা ঠিক নয়। বরং স্পার্টাই একদিন পিছু হটে গেল। যুদ্ধ, বীরত্ব আর পরাক্রমে এথেন্স শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।


পেরিক্লিস

এথেন্সে গণতান্ত্রিক শাসন-বিধি প্রথমে প্রবর্তন করেন সোলন নামে একজন আইনজ্ঞ। গণতন্ত্রের মূল কথা হল জনসাধারণকে শাসনকার্যে সমান সুযোগ ও সমান সুবিধা দেওয়া। মনে রাখা দরকার, এথেন্সে জন-সাধারণ বলতে বোঝাত প্রধানতঃ অভিজাতদের। পরে ক্লাইস্থিনিস

নামে একজন আইন-প্রণেতা সোলনের গণতান্ত্রিক শাসনবিধিকে আরও উন্নত করেন। সোলন-ক্লাইস্থিনিসের প্রদর্শিত পথে চলে। পেরিক্লিস সেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সর্বমুখী বিকাশ সাধন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এথেন্স এক অপরাজেয় মহিমা লাভ করে। শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্ম ও দর্শনে এথেন্স হয় গ্রীসদেশের সবচেয়ে সেরা দেশ। সাহিত্য-জগতে সফোক্লিস-ইউরিপিডিসের নাটক, সক্রেটিস-প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা, হেরোডোটাসের ইতিহাস ভাবনা, পেরিক্লিসের রাজনৈতিক চিন্তা—এসব এথেন্সে আনে এক নতুন যুগ। ইতিহাসে এ যুগকে বলা হয় **'এথেন্সের স্বর্ণযুগ'**।

পেরিক্লিস : খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সে একজন বীর দেশনায়কের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম পেরিক্লিস। তাঁর সুগঠিত নেতৃত্বে এথেন্সবাসী সাহসী ও পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। এথেন্স সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র গ্রীসদেশের সীমানায় আটকে রইল না। পেরিক্লিস একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত নৌ-বাহিনী এথেন্সের ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূল নিয়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। তাঁর শাসনকালে এথেন্সে আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ধর্ম ও দর্শনের বিকাশ ঘটে। পেরিক্লিসের শাসনসমৃদ্ধ তৎকালীন এথেন্সকে এজন্য ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—**'এথেন্সের স্বর্ণযুগ**।

সাহিত্য : সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্য ও নাটকে এথেন্স স্বর্ণযুগের প্রসিদ্ধি লাভ করে। হোমারের ইলিয়াড ওডিসির ন্যায় মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। এ সময়ে ছোট ছোট লিরিক বা গীতি-কবিতা রচিত হয়। এগুলি লায়ার নামে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করা হত। এ-যুগের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, প্রকৃতি, বীরত্ব-গাঁথা ও সৌন্দর্যবোধ। এ সময়কার কবিদের মধ্যে স্যাফো এবং **পিণ্ডার** অন্যতম। স্যাফো ছিলেন একজন মহিলা গীতি-কবি। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য। বীরত্বপূর্ণ

গাঁথা রচনায় পিণ্ডারের সুনাম ছিল। এথেন্সবাসীর আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপায় ছিল—নাটকের অভিনয়। সেজন্য নাটক রচনায় এ যুগের নাট্যকারগণ উৎসাহিত হন। ডায়োনীসাস্-এর মন্দির ছিল এথেন্সের রঙ্গমঞ্চ। পেরিক্লিসের সময়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন **সফোক্লিস, ঈসকাইলাস ও ইউরিপিডিস**। তাঁদের নাটকে সে-যুগের এথেন্সবাসীর প্রাণ ও মনের কথা বাণীবদ্ধ হয়েছিল।

তখন এথেন্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের পুরস্কার দেওয়া হত। স্বর্ণযুগে এথেন্সের যে-সব নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের নাটককে আজও পাশ্চাত্য নাটকের প্রধান আদর্শরূপে স্বীকার করা হয়। ঈসকাইলাসকে বলা হয় গ্রীক-ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটকের জনক। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটক হল 'প্রমিথিউস বাউণ্ড'। এতে মানুষের অনিবার্য নিয়তির কথা বলা হয়েছে। গ্রীক-ট্র্যাজেডি রচয়িতা নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সফোক্লিস। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটক হল, 'অডিপিউস রেক্স', 'এন্টিগোনে' ও 'ইলেকট্রা'; এগুলিতেও মানুষের অনিবার্য বিয়োগান্তক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এরিস্টফেনিস কমেডি বা হাসি-ঠাট্টার বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে ব্যঙ্গ-নাটক রচনাতেও তাঁর খ্যাতি ছিল।


দার্শনিক সক্রেটিস

দার্শনিক সক্রেটিস : দর্শনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রবর্তক সক্রেটিস এই যুগেই আবির্ভূত হন। সব ধর্ম ও অন্ধ বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বললেন, কেবল যুক্তি দিয়ে বোঝা খাঁটি জ্ঞানই সত্য, আর সবই মিথ্যা। সক্রেটিসের দার্শনিক মতবাদে

দেবতার বিধানকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার কথা বলা হয়েছে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বতন্ত্র মহিমা ও গৌরব দেওয়া হয়েছে ; তাই একে বলা হয় **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ**। সক্রেটিস সহজ ভাষায় ও খোলা মনে সকলকে উপদেশ দিতেন। তাঁর জীবনধারা ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। এথেন্সের তরুণেরা দলে দলে তাঁর কাছে এসে ভিড় করত, তাঁর কথা শুনত। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সক্রেটিসের এরূপ জনপ্রিয়তা একদল লোকের বিরূপতার কারণ হয় ; সেজন্য তারা তাঁর নামে সরকারের কাছে অভিযোগ তোলে। তাদের প্রধান অভিযোগ ছিল— সক্রেটিস ধর্ম মানছেন না, দেশের তরুণদের তিনি ভুল পথে পরিচালিত ও বিভ্রান্ত করছেন। এর পর বিচারের নামে চলে প্রহসন। শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসের প্রাণ-দণ্ডাদেশ হয়। তিনি হাসিমুখে 'হেমলক' নামক তরল বিষ পান করে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করেন।



ঐতিহাসিক হেরোডোটাস

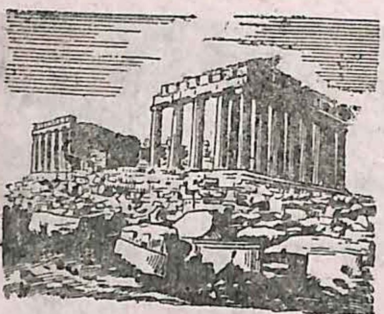
সক্রেটিসের মৃত্যু হলেও তাঁর মতবাদ কিন্তু এথেন্স থেকে মুছে যায়নি। পরবর্তী-কালে তাঁর মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই দর্শনের যুক্তিবাদ গড়ে ওঠে। প্লেটো, এ্যারিস্ট-টল প্রভৃতির প্রচেষ্টায় সক্রে-টিসের যুক্তিবাদ পরে আরও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস : গ্রীসদেশে দর্শন-চর্চার অনুরূপ ইতিহাসেরও চর্চা হত। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস এই এথেন্সেই জন্মেছিলেন। হেরোডোটাস কাহিনী বলার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে ইতিহাস রচনা করতেন। তার সঙ্গে মিশে থাকত

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনার আগ্রহ। পারস্যের সঙ্গে এথেন্সের দীর্ঘ দিন ধরে এক যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন হেরোডোটাস। তাই তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণী সত্য অভিজ্ঞতার ওপর গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার তিনিই পথদ্রষ্টা। সেজন্য তাঁকে বলা হয় **ইতিহাসের জনক**।

হেরোডোটাস ছাড়া এ সময়কার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন থুকিডিডিস; এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে দীর্ঘ সাতাশ বছরের পিলোপনেসিয়ার যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ যুদ্ধের বিবরণী লেখেন। হেরোডোটাসের মত সত্য-ঘটনা বর্ণনাই ছিল থুকিডিডিসের ইতিহাস রচনার প্রধান ভিত্তি।

শিল্প ও ধর্ম ঃ এথেন্সবাসীর প্রধান দেবী ছিলেন এথেনা। ডায়োনিসাস ছিলেন শিল্পের দেবতা। এথেন্সবাসী গৃহনির্মাণ ও ভাস্কর্যের দিক থেকে খুবই কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল। এথেনা দেবীর মন্দির পার্থেনন তারই অপরূপ নিদর্শন। **ফীডিয়াস** এই মন্দিরের রূপসজ্জা করেছিলেন। **প্র্যাকসিটিলিস্‌** ছিলেন এ যুগের একজন বিখ্যাত ভাস্কর।



পার্থেনন

এই সময়কার ভাস্করদের দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণে মানুষের নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব প্রকাশিত হয়েছে। গ্রীকদের শিল্পরীতির চরম সমৃদ্ধি এ সময়েই ঘটেছিল। এর প্রভাব সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি আমাদের দেশেও গ্রীকশিল্প ও স্থাপত্য-রীতির প্রভাব আজও বজায় আছে।

ম্যাসিডন রাজ্যের উত্থান ঃ দীর্ঘকাল ধরে গ্রীসদেশে এথেন্স ও স্পার্টাই ছিল প্রধান শক্তি। কিন্তু পরবর্তীকালে ম্যাসিডন নামে নগর-

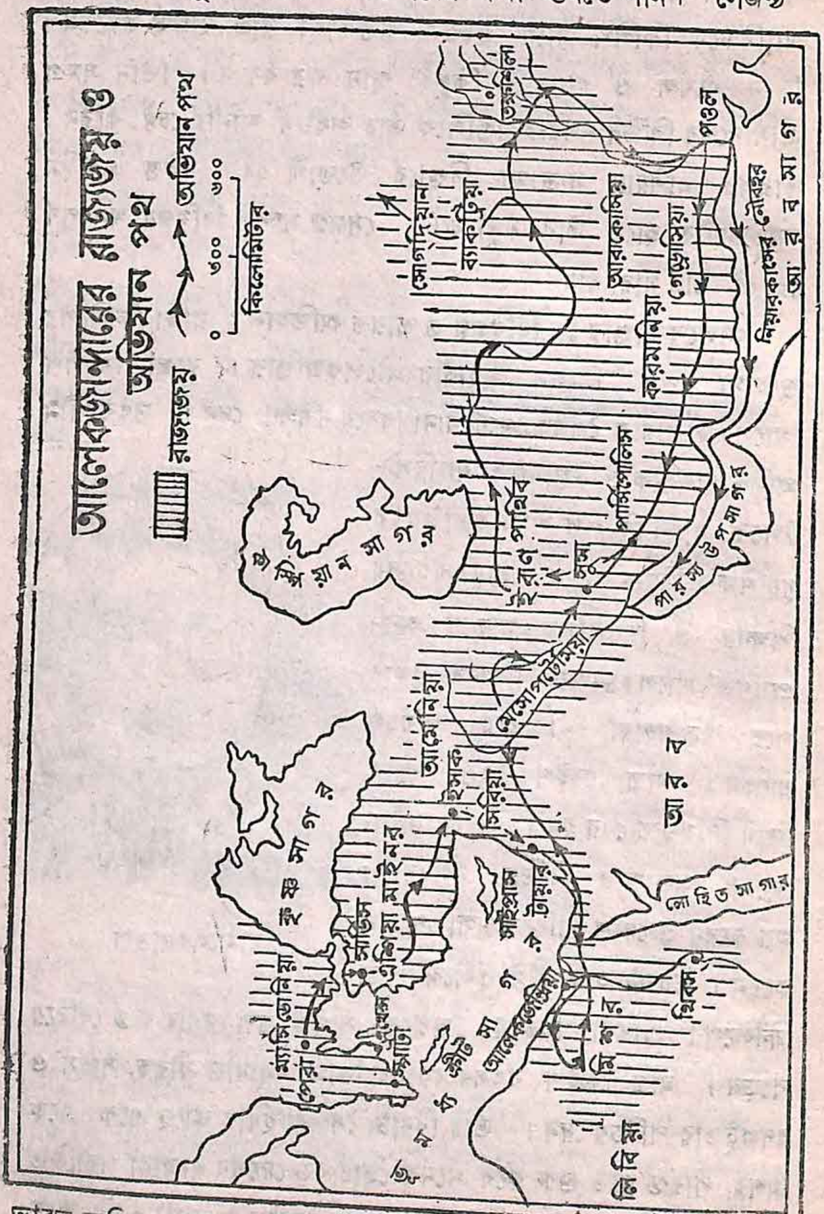
রাষ্ট্রের উত্থানের ফলে এই দুইটির প্রভাব অনেকাংশে খর্ব হয়। ম্যাসিডন হয়ে ওঠে গ্রীসদেশের প্রধান শক্তি। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যাসিডনে **ফিলিপ** নামে একজন শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি এথেন্স ও স্পার্টার কিছুটা স্থান জয় করেন। তিনি সমগ্র গ্রীসদেশের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রগুলিকে তাঁর অধীনে আনার চেষ্টা করেন। তারপর এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। কিন্তু একদিন আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেজন্য সম্পূর্ণ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি মারা যান।

আলেকজাণ্ডার : দিগ্বিজয় ও ভারত অভিযান : রাজা ফিলিপের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন **মহাবীর আলেকজাণ্ডার**। রাজা ফিলিপ আলেকজাণ্ডারকে শৈশব থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক **এ্যারিস্টটলকে** রাজা ফিলিপ আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ্যারিস্টটলের শিক্ষায় ও ফিলিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত আলেকজাণ্ডার পিতার মৃত্যুর পরে দিশেহারা না হয়ে অবিচল থাকেন। মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি দিগ্বিজয়ে বের হন। প্রথমে গ্রীসদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নগররাজ্য জয় করেন ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তারপর ৩৩৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পিতা ফিলিপের পৃথিবী বিজয়ের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাত্র তেইশ বৎসর বয়সেই তিনি অসামান্য বীরত্ব, সাহস ও রণপটুতার পরিচয় দেন। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনীর কাছে একে একে মিশর, পারস্য হতে শুরু করে অনেক ছোট-বড় দেশের রাজারা পরাজিত হন। এইভাবে গড়ে ওঠে আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য। সব শেষে তিনি পারস্য অভিযান করেন। এরপর তিনি পাড়ি দেন ভারতবর্ষে।



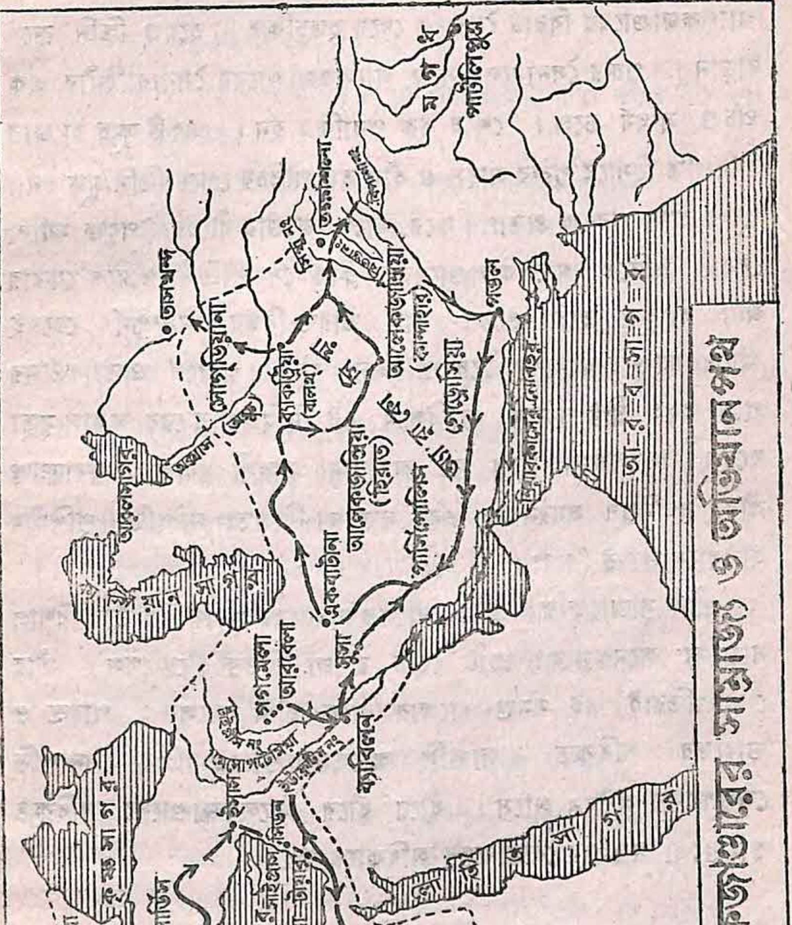
আলেকজাণ্ডার

ভারত-অভিযান : আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করার পরে ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য ও সম্পদের কথা শুনতে পান। সেজন্য



ভারত-অভিযানের জন্য তিনি ও তাঁর সৈন্যদল উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি খাইবার পথ ধরে স্থলপথে ভারতে এসে পৌছান।

খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময়ে এ দেশে ছোট-বড় রাজ্য ছিল। সেগুলির মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ চলত। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার



করেন। তিনি তাঁকে অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন। এর পর আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে তাঁর

করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি তক্ষশীলায় গ্রীস সৈন্যদল মোতায়েন করেন, তারপর ঝিলাম নদী অতিক্রম করে পুরুর রাজ্যে উপস্থিত হন।

পুরু ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাঁর সাহস ছিল অসামান্য। তাই আলেকজাণ্ডারের বিরাট সৈন্যদল দেখে হতচকিত না হয়েও তিনি রুখে দাঁড়ান। পুরুর সৈন্যদলের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। শেষে পুরু পরাজিত হন। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হিসাবে পুরুর সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। পুরুর রাজ্য পুরুকে প্রত্যর্পণ করে আলেকজাণ্ডার বীরের উপযুক্ত মর্যাদা দেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের রণক্লান্ত সেনাবাহিনী স্বদেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই ভারত-বিজয় অসম্পূর্ণ রেখেই আলেকজাণ্ডার স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে এই দিগ্বিজয়ী বীরের অকাল-মৃত্যু ঘটে। আলেকজাণ্ডারের মত অসামান্য সাহসী যোদ্ধা, পরাক্রান্ত বীর, রণনিপুণ সমরনায়ক এবং সাম্রাজ্য-বিজেতা নরপতি—পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই বিরল।

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেল। তাঁর সেনাপতিরাই এই সমস্ত রাজ্যের রাজা হ'য়ে বসলেন। পারস্য ও ভারতের অধিকৃত রাজ্যগুলি আলেকজাণ্ডারের প্রিয় সেনাপতি **সেলুকসের** অধীনে আসে। ধীরে ধীরে আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত স্থানগুলো অতঃপর রোমানদের অধিকারে যায়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)

১। প্রাচীন গ্রীকজাতি ও তার সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান? এই সভ্যতায় কোন্ সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?

২। হোমারের রচিত মহাকাব্যগুলির পরিচয় দাও। হোমারের যুগকে বীর যুগ বলা হয় কেন?

৩। প্রাচীন গ্রীসদেশের নগর-রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে কি জান?

৪। ক্রীটদ্বীপের সভ্যতা সম্পর্কে কি জান?

৫। এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। এথেন্সের স্বর্ণযুগ সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

৭। এথেন্সের স্বর্ণযুগের শিল্প ও ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ও ভারত অভিযান সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer-Type Questions)

১। সক্রেটিসের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে কি জান?

২। ইতিহাসের জনক কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৩। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের পরিচয় দাও।

৪। আলেকজাণ্ডার ও পুরুর সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

৫। স্পার্টা ও এথেন্সের জীবনধারার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। সফোক্লিস সম্বন্ধে কি জান?

৭। থুকিডিডিস-এর পরিচয় দাও।

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective-Type Questions)

১। **মৌখিক প্রশ্ন**ঃ (ক) কে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন? (খ) গণতন্ত্রের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল কোথায়? (গ) অস্তি কোথাকার রাজা ছিলেন? (ঘ) আলেকজাণ্ডারের গৃহ-শিক্ষক কে ছিলেন? (ঙ) ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটকের জন্মদাতা কে? (চ) 'প্রমিথিউস বাউণ্ড' নাটকটি কার লেখা? (ছ) শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটক রচয়িতা কে? (জ) এ্যারিস্টফেনিস কে ছিলেন? (ঝ) পার্থেনন কি? (ঞ) ইউরিপিডিস কে ছিলেন? (ট) এথেন্সের স্বর্ণযুগের বিখ্যাত ভাস্কর কে ছিলেন? (ঠ) প্র্যাকসিটিলিস কে ছিলেন? (ড) নোসাস কোথাকার রাজধানী ছিল? (ঢ) স্যাফো কে?

২। কোন্ উত্তরটি সঠিক তা খুঁজে বের কর ও এরূপ (✓) চিহ্নিত করে দেখাও ঃ

(ক) হোমার কে ছিলেন ? — কবি/নাট্যকার/মহাকবি

(খ) কোথায় প্রথম গণতন্ত্রের বিকাশ হয় ? — স্পার্টায়/ম্যাসিডনে/এথেন্সে

(গ) ইতিহাসের জনক কাকে বলা হয় ? — সক্রেটিস/হেরোডোটাস/সফোক্লিস

(ঘ) ট্র্যাজেডির জন্মদাতা কাকে বলা হয় ? — সফোক্লিস/ঈসকাইলাস/এ্যান্টিগোনে

(ঙ) সক্রেটিস কে ছিলেন ? — কবি/দার্শনিক/নাট্যকার

(চ) আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানে কে বাধা দেন ? — অম্ভি/পুরু/চন্দ্রগুপ্ত

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) রাজা — সুযোগ্য পুত্র ছিলেন — আলেকজাণ্ডার ? (খ) এসেন্স-বাসীর প্রধান দেবী ছিলেন —। (গ) দীর্ঘকাল ধরে গ্রীসদেশে — ও — ছিল প্রধান শক্তি। (ঘ) স্পার্টার — বর্তমান পৃথিবীতে —। (ঙ) আমাদের দেশের — ও মত হোমার ছিলেন একজন —।

৪। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) সফোক্লিস ছিলেন এথেন্সের স্বর্ণযুগের একজন দার্শনিক। (খ) সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য ছিলেন এ্যারিস্টটল। (গ) লাইকারগাস এথেন্সের শাসন-বিধি রচনা করেন। (ঘ) ফিডিয়াস ছিলেন এথেন্সের একজন গীতিকবি। (ঙ) পিণ্ডার ছিলেন এথেন্সের একজন ভাস্কর। (চ) লিরিক বলতে বোঝায় বীরত্বপূর্ণ গাঁথা কাব্য।

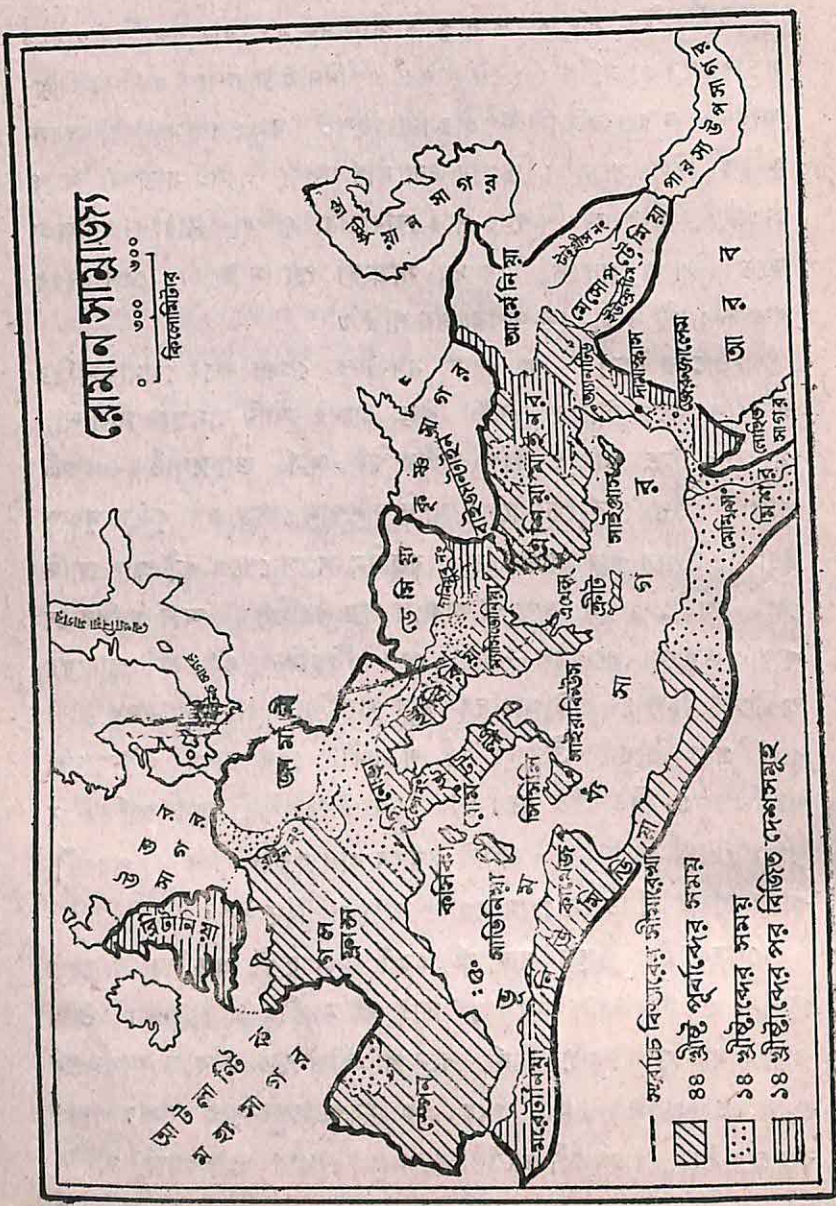
পঞ্চম অধ্যায়	সাম্রাজ্যবাদী রোমানজাতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ও তার সভ্যতা

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রীকদের মত রোমানজাতির দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত। এই দেশও একদিন ইউরোপকে সাহিত্য-শিল্প-আইন—আরও কত কি উপহার দিয়েছিল। তবুও রোমানদের প্রধান কৃতিত্ব ছিল সাম্রাজ্য স্থাপন এবং দীর্ঘকালব্যাপী সেই সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখায়। গ্রীকদের পতনের পরে রোমানেরা এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা জুড়ে বিশাল অঞ্চলে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে। বেশ কয়েক শতাব্দীব্যাপী তারা ছিল অপরাজেয় শক্তি।

রোমের উদ্ভব: যে রোম নগরীকে কেন্দ্র করে রোমানজাতির ইতিহাস গড়ে উঠেছে—সেটা কিন্তু তাদের আদি বাসস্থান ছিল না। গ্রীকদের মত তারাও ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। উত্তর-পূর্ব ইউরোপের আদি বাসস্থান ছেড়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে ইটালীর উত্তরে এসে হাজির হয়। বহুদিন আগে থেকে এট্রাস্কান জাতি রোম নগরী স্থাপন করে ঐ অঞ্চলে বাস করছিল। আর্য জাতির যে শাখা ওখানে এসেছিল—তারা বেশ কিছুদিন এই এট্রাস্কানদের অধীনেই ছিল। এট্রাস্কানদের ভাষা ল্যাটিনকে তারা নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এট্রাস্কানরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য জাতির যে শাখা রোমে এসেছিল—তারাই ওখানে বাস করতে থাকে। পরবর্তীকালে তারাই ইতিহাসে রোমানজাতি রূপে পরিচিত হয়।

রোমনগরীর উদ্ভব সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রেমাস ও রমিউলাস নামে দুই ভাই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা তাদের মা কর্তৃক শৈশবে নির্জনে বনে পরিত্যক্ত হয়ে, নেকড়ে বাঘের দুধ খেয়ে প্রতিপালিত হন। পরে এক মেষপালকের গৃহে আশ্রয় পান। বড় হয়ে তাঁরা রোমনগরী প্রতিষ্ঠা করেন। রেমাস ভ্রাতৃকলহে রমিউলাসের হাতে প্রাণ হারান। আর রমিউলাসের নাম অনুসারে গড়ে ওঠে রোমনগরী। খুব সম্ভব রোম নগরীর প্রথম রাজা ছিলেন রমিউলাস।

রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ ঃ টাইবার নদীর তীরে ইটালীর এক ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব পেয়ে রোমানেরা খুশি হল না। এট্রাস্কানরা তো হটে



গেছে—এবার হাত-পা ছড়িয়ে রোমানরা নতুন দেশ জয়ের নেশায়

মেতে উঠল। পারস্য সম্রাট সাইরাসের কাছে দু'-দুবার হেরে গিয়ে রোমানরা একটু ভেঙ্গে পড়েছিল বৈকি! অন্য দিকে ছিল গল নামে আর একটি দুর্দান্ত জাতির দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়। তাই রোমানরা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রস্তুতি চালিয়ে যায়। হঠাৎ তাদের নজরে আসে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিশালী কার্থেজনগরী।

কার্থেজ ছিল উত্তর-আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী একটি ছোট বাণিজ্য নগরী। ফিনিশিয় নামে সেমিটিক জাতির এক শাখা এই নগরীটি গড়ে তুলেছিল। এক সময়ে ফিনিশিয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠজাতি। বিশেষ করে জলপথে ছিল তাদের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তারা ছিল সুদক্ষ নাবিক। এক সময়ে কার্থেজের অধিবাসীরা ভূমধ্যসাগরের জলপথে একচেটিয়া বাণিজ্য চালাত। তারা বহু দ্বীপ-উপদ্বীপে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। কার্থেজবাসীর এইরূপ অগ্রগতি রোমানদের কাছে ক্রমশঃই ঈর্ষা ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ওরা কার্থেজবাসীকে আঘাত করার জন্য নতুন নতুন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করে, তলে তলে প্রস্তুত হতে থাকে। এক প্রকার চলন্ত সাঁকো তৈরি করিয়ে রোমানরা বিচিত্র ধরনের জলযান নির্মাণ করে। এতে এমন ব্যবস্থা থাকে—যাতে রোমানদের যুদ্ধ শুরু হলে শত্রুর জাহাজে গিয়ে আঘাত হানতে না পারে। রণপ্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পরে রোমানরা কার্থেজবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ একশ' বছরেরও বেশীকাল ধরে রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ চলেছিল। ইতিহাসে রোম-কার্থেজের এই সংঘর্ষ পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। ল্যাটিন ভাষায় পিউনিক বলতে বোঝায় কার্থেজকে। তাই রোম-কার্থেজ সংঘর্ষের এইরূপ নামকরণ করা হয়।

ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি নামে একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পূর্ব দিকে রাজত্ব করতেন একজন গ্রীক রাজা। ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে একদল জলদস্যু তাঁর রাজ্যে হামলা চালায়। সেই রাজা নিরুপায় হয়ে কার্থেজের সাহায্যপ্রার্থী হন। রোম আর কার্থেজের দূরত্ব ছিল মাত্র

সত্তর মাইল। কার্থেজ যেইমাত্র গ্রীকরাজাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল—রোমানরাও তখন জলদস্যুদের পক্ষ নিল। কারণ রোমানেরা ভেবে দেখল—সিসিলি দ্বীপে কার্থেজ যদি প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তাদের পক্ষে অদূরভবিষ্যতে রোমে অভিযান চালানও অসম্ভব নয়। এই আশঙ্কা করেই রোম তার সবটুকু শক্তি নিয়ে কার্থেজের ওপর আঘাত হানল। পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত **প্রথম পিউনিক যুদ্ধে** কার্থেজবাসী পরাজিত হয়। সিসিলি দ্বীপের বাণিজ্যিক অধিকার রোমানদের হাতে চলে যায়। কার্থেজবাসী সে-যাত্রায় কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের বেশ কিছু দিন পরে, কার্থেজের অধীন স্পেনের শাসনকর্তা হয়ে আসেন **হ্যামিলকার বার্কা** নামে একজন সমরকুশলী সেনানায়ক। তিনি কার্থেজবাসীর মধ্যে গভীর স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। **হ্যামিলকার** বার্কার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন **হ্যানিবল**। মাত্র নয় বৎসর বয়সে হ্যানিবল তাঁর বাবার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হ্যামিলকারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হ্যানিবল উপলব্ধি করেন—রোমানেরা কার্থেজবাসীর শত্রু ; তাদের সঙ্গে কোন-রূপ-আপোস নয়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারাটা কার্থেজবাসীর পক্ষে অপমানজনক।

কার্থেজবাসী চিরশত্রু রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরসেনানী হ্যানিবলের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই স্বদেশপ্রেমিক বীরসেনানী কার্থেজবাসীকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি যে-কোন উপায়ে কার্থেজবাসীর হাতছাড়া সিসিলি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি চালান। এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও দুঃসাহসী বীরদের নিয়ে তিনি রোমনগরীতে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল, অদম্য সাহস ও বিরাট সৈন্যদল থাকা সত্ত্বেও কার্থেজবাসী পরাজিত হয়। হ্যানিবল তাঁর সুগঠিত বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে ইটালীতে পৌঁছান। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি সাফল্য

লাভ করেছিলেন। কিন্তু রোমানেরা তখন কূটনৈতিক চাল চেলে স্পেন ও সিসিলিতে সৈন্য পাঠায়। সেখানে গিয়ে তারা কার্থেজ-বাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেয়। লোক ও রসদের অভাবে হ্যানিবলের সৈন্যবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। ক্রমশঃ কার্থেজ-বাহিনী দুর্বল হতে থাকে। ইতিমধ্যে রোমান-নায়ক সিপিও আফ্রিকায় এসে কার্থেজে অভিযান চালালেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হ্যানিবল সসৈন্যে কার্থেজের উদ্দেশ্য রওনা হন। কিন্তু জামার যুদ্ধে রোমানেরা তাঁর সৈন্য-দলের গতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত হ্যানিবল পরাজিত হন। পরাজিত কার্থেজ নায়ক হ্যানিবল পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পরে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।



হ্যানিবল

হ্যানিবল ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম, রণচাতুর্য এবং বীরত্ব তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাই হ্যানিবলের মত পরাক্রান্ত বীরের এরূপ নির্মম পরিণতি সত্যই বেদনাদায়ক।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজবাসীকে ভূমধ্যসাগর হতে একেবারে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি রোমানদের হাতে চলে যায়। কার্থেজবাসী ক্রমশঃ দুর্বলতর হতে থাকে। খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪৬ অব্দে শেষ **পিউনিক যুদ্ধ** অনেকটা 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের' মত। রোমানরা কার্থেজবাসীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যই এই যুদ্ধ শুরু করে। কার্যতঃ তাহাই হয়। কার্থেজের বহু লোক রোমানদের হাতে নিহত হয়। অনেককে আবার ধরে নিয়ে গিয়ে রোমে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। কার্থেজ নগরীর অবসানের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী উপনিবেশগুলিতে রোমের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কার্থেজের আর কোন ভাবেই মাথা তোলার মত সুযোগ থাকে না। রোমান নায়ক কেটোর স্বপ্ন সার্থক হয়। সমৃদ্ধ কার্থেজ হয় মহাশ্মশান।

প্রাচীন রোমান সমাজ-ব্যবস্থাঃ রোমদেশে প্রথমে রাজারা রাজত্ব করতেন। রাজারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে শুরু করলে, রোমানরা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে **সাধারণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা করে। দুইজন সদস্যের উপর দেশ-শাসনের ভার অর্পণ করা হয়। এঁরা ছিলেন সামরিক প্রধান। এদের বলা হত কন্সাল; আর কন্সালদের সাহায্য করার জন্য অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় একটি সভা বা **সিনেট**। সিনেট বা সভার সঙ্গে পরামর্শ করেই দুইজন সদস্য দেশ চালাতেন। ক্রীতদাস ও মহিলাগণ দেশশাসনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেত না। সাধারণ দরিদ্র শ্রেণী—এমন কি, মধ্যবিত্তরাও সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত ছিল। দেশে বহু ক্রীতদাস ছিল। তারা ছিল পরাধীন।

প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানঃ ধনী ও অভিজাতশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী—রোমে এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল। এরা ছাড়া ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস। রোমের অভিজাত ব্যক্তিদের বলা হত **প্যাট্রিশিয়ান**। এরা দেশের শাসনকার্যে অংশ নিত। এরাই সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। এরাই হত সিনেটের সভ্য, বিচারপতি, কন্সাল। দেশের আইন-কানুন এই প্যাট্রিয়িয়ান বা অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হত। সুবিচার পেত কেবলমাত্র তারাই। তারাই সিনেটের সভ্য নির্বাচন করত। মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রোমের অসহায় দরিদ্রশ্রেণীকে বলা হত **প্লিবিয়ান**। এরা ছিল পরাধীন। চাষবাস এবং সর্বপ্রকার উৎপাদনমূলক কাজে এরাই কঠোর পরিশ্রম করত। রোমানবাহিনী দেশ-বিদেশে বিজয়-অভিযান চালিয়ে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করে আনত। সে-সব কিছুই ভোগ করত ধনী অভিজাত বা প্যাট্রিশিয়ানেরা। প্লিবিয়ান বা দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধে প্রাণ দিত। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোমানবাহিনীর জন্য সাফল্য ও গৌরব বয়ে নিয়ে আসত। তবুও প্যাট্রিশিয়ানেরা তাদের কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইত না; বরং এর উল্টো ফল ফলত। যেসব প্লিবিয়ান চাষ

বা অন্য কোন কাজের জন্য ধার নিয়ে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারত না, তাদের ঘৃণ্য ক্রীতদাস জীবন বেছে নিতে হত। চরম দুঃখ-দুর্দশা ছিল প্লিবিয়ানদের নিত্যসঙ্গী। তবুও তারা নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা-নির্যাতন সয়ে যেত। দীর্ঘকাল তারা মুখ ফুটে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নি। নীরবে সবকিছু সহ্য করে গেছে।

রোমের নাগরিকতাঃ রোমে কেবলমাত্র অভিজাত ব্যক্তিরাই নাগরিক অধিকার ভোগ করত। দরিদ্র ক্রীতদাসদের জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ। এদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকদেরও নয়। মধ্যবিত্ত-দেরও কন্সাল নির্বাচিত হবার অধিকার ছিল না। কার্যতঃ অভিজাতেরাই দেশ চালাত।



রোমের ক্রীতদাস

ক্রীতদাসত্ব হতে মুক্তির সংগ্রামঃ রোমানেরা নতুন বিজিত সাম্রাজ্য হতে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করেই নিবৃত্ত হত না। তারা সেখানকার শত্রু-পক্ষীয় যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে চালান দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করত। ক্রীতদাসদের কল-কারখানায় অথবা চাষের ক্ষেতে বেগার খাটান হত। যে প্রতিবাদ করত, তার পরিণতি হত খুবই শোচনীয়। প্যাট্রিশিয়ান বা অভিজাতেরা তাদের ওপর যে-কোন প্রকার নির্যাতন চালাতে দ্বিধা-বোধ করত না। এমনিভাবে চলে বহুকাল। বহু অভিজাত যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রচুর বিত্ত সম্পদের অধিকারী হত। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে যায়। সেজন্য এসব অন্যায় ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করলেও কোন ফল হত না। রোমের ক্রীতদাসেরা দীর্ঘ

কাল ধরে নাগরিক অধিকার না-পাবার জন্য ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অভিজাতদের অত্যাচারের মাত্রা এক সময়ে খুবই বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র ক্রীতদাসদের একদিকে যেমন নাগরিক অধিকার ছিল না—অন্যদিকে তেমনি ন্যায়-বিচার লাভেরও তাদের কোন অধিকার ছিল না। দেশের আইন-কানুন রচনা করত ধনী অভিজাতেরা। আবার তারাই দেশ-শাসন চালাত। তারা ভাবত ক্রীতদাস ও প্লিবিয়ানদের কোন সুযোগ দিলে তাদের প্রভুত্ব টিকবে না। কারণ অভিজাতেরা সংখ্যায় ছিল কম। তাই অভিজাত প্যাট্রিশিয়ানরা দরিদ্রশ্রেণী বা প্লিবিয়ান, ক্রীতদাস এবং মধ্যবিত্তদের পর্যন্ত রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। রোমান ক্রীতদাসেরা দীর্ঘকাল সয়ে গেছে এদের নির্যাতন। কিন্তু এক সময়ে তারা উপলব্ধি করল—এই প্যাট্রিশিয়ানেরা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, সবাই মিলে লড়াই করে সেটা আদায় করে নিতে হবে। সেজন্য ক্রীতদাসদের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। এই সময় **স্পার্টাকাস** নামে একজন নেতার আবির্ভাব হয়।

স্পার্টাকাস ছিলেন দৃঢ়চেতা, আপোসহীন ও অনমনীয় মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সাহস ও সংগঠন-শক্তি ছিল অতুলনীয়। ক্রীতদাসেরা তাঁর নেতৃত্বে প্যাট্রিশিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। বীর সেনানী স্পার্টাকাসের সুগঠিত নেতৃত্বে রোমান ক্রীতদাসেরা মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য বিদ্রোহ করে। প্রায় ৭০,০০০ হাজার ক্রীতদাস এতে অংশ নেয়। ক্রীতদাসেরা তাদের নেতা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে জীবন-মরণ সংগ্রাম চালায়। বহু দিন ধরে এই সংগ্রাম চলে। প্যাট্রিশিয়ানদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করতে বেশ বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত তারা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে। বহু ক্রীতদাস যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এই বিদ্রোহের পরে রোমান অভিজাত বা প্যাট্রিশিয়ানেরা ক্রীতদাস ও দরিদ্রশ্রেণীকে বিচার ও শাসন-সংক্রান্ত ছিটে-ফোঁটা সুযোগ-সুবিধা দেয়। কিন্তু দেশ-শাসনের সমস্ত রকম বড় সুযোগ সুবিধা অভিজাতদেরই একচেটিয়া

অধিকারে থাকে। অর্থাৎ সাময়িকভাবে জোড়াতালি দিয়ে দায়সারা গোছের একটা আপোস করে। কিন্তু তলে তলে ক্রীতদাসদের মধ্যে অসন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ক্রীতদাসদের এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও তাদের এই সশস্ত্র প্রতিরোধ যুগে যুগে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বীর সেনানী স্পার্টাকাস ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তার শৌর্য, বীর্য ও অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনী যুগে যুগে লাঞ্ছিত নির্যাতিত মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। তাই গল্পে-গাঁথায় তাঁর কাহিনী পড়ে আজও আমরা উদ্দীপিত হয়ে উঠি।

রোমের সাধারণতন্ত্রের অবসান : রোমানেরা ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী পৃথিবী-জোড়া বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। যুদ্ধে জয়ী সমরনায়কেরা ক্রমশঃ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে ফিনিশিয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কার্থেজ নগরী রোম-সাম্রাজ্যের অধিকারে আসার পরে, একদল ব্যবসায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য করে অপর্যাপ্ত ধন-দৌলত অর্জন করে। দেশশাসন কার্যতঃ এদেরই পরোক্ষ নির্দেশে পরিচালিত হত। এদের প্রভাবপুষ্ট যে দুইজন শাসক বা কন্সাল থাকত, তারা পুরোপুরি এদের নির্দেশ মতই চলতে বাধ্য হত। এই অবস্থায় সামরিক প্রধানেরা অভিজাতদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটান। সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে দেখা দেয় সামরিকতন্ত্র।

জুলিয়াস সীজার : আজ হতে দু'হাজার বছর আগে জুলিয়াস সীজার নামে একজন সমরনায়ক বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার সাধন করেন।

জুলিয়াস সীজার ছিলেন সমরনিপুণ সেনানায়ক, সুদক্ষ কুটনীতিক ও বাগ্মী। তিনি গল দেশ জয় করে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

ইংলণ্ডেও তিনি বিজয় অভিযান চালান। এমনি করে ধীরে ধীরে তিনি খুব প্রভাবশালী হন। সমস্ত রোমে একসময় তিনি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশবাসী তাঁর হাতে রোম সাম্রাজ্যের শাসনভার তুলে দেয়। সীজারের ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি অনেকেই ভাল চোখে দেখতে পারল না। কারণ জুলিয়াস সীজার ছিলেন



জুলিয়াস সীজার

স্বাধীনচেতা ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আগেই বলা হয়েছে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে রোমের অভিজাতেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। কন্সালকে তাদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করে। তাই জুলিয়াস সীজার কন্সালের পদ তুলে দিয়ে দেশের সমস্ত শাসনভার তাঁর নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর সু-শাসনে দেশে নানা প্রকার উন্নতি ঘটে। তিনি রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, বাঁধ তৈরী করা ইত্যাদি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে উচ্চাভিলাষ জাগে। তিনি নিজেকে 'রোমের একচ্ছত্র সম্রাট' ও 'ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে'

প্রচার চালান। শেষ পর্যন্ত সেনেট গৃহে ব্রুটাসের মত অন্তরঙ্গ সহচরদের চক্রান্তে সীজারকে প্রাণ দিতে হয়।

জুলিয়াস সীজার ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি সুলেখক ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় গল দেশে অভিযানের বৃত্তান্ত রচনা করেন। এটি ল্যাটিন ভাষায় উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের নমুনা-রূপে আজও স্বীকৃত হয়। আমরা যে বারো মাসের ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করি, তার প্রবর্তক সীজার। সীজারকে হত্যা করলেও ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। গল্পে-উপন্যাসে নাটকে আজও তাঁর কীর্তি প্রচারিত হয়। জুলিয়াস সীজারের জীবনকাহিনী নিয়ে জগৎ-প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপীয়ার একটি নাটক লিখেছেন। বড় হয়ে সে নাটকটি পড়লে তাঁর সম্বন্ধে তোমরা আরও অনেক কথা জানতে পারবে।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ সীজারের হত্যাকারীরা ভেবেছিলেন যে তাঁকে মেরে ফেলতে পারলেই বোধহয় রোমে সাধারণতন্ত্রের নতুন করে প্রতিষ্ঠা হবে। প্যাট্রিশিয়ানেরা আগের মতই নিজেদের পছন্দসই ব্যক্তিদের কন্সাল নির্বাচন করবে ও একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটবে। সীজারের হত্যাকারীদের সে আশা কিন্তু সফল হল না। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পরে তাঁর পালিত পুত্র ও ভাগিনেয় **অগস্টাস সীজারকেই** রোমবাসী সম্রাট মনোনীত করে। তিনি অক্টোভিয়ান সীজার নাম গ্রহণ করেন। অক্টোভিয়ান সীজার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

অগস্টাস সীজার গ্রীস দেশে লেখাপড়া করেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে দেশবাসী তাঁর হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়। তিনি কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি সিনেটের সভ্যদের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, একে একে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। সময় সুযোগ মত তিনি নিজেকে রোমের সম্রাট রূপে ঘোষণা করেন।

অক্টোভিয়ান সীজারকে রোমের সিনেট উপাধি দিল **'অগস্টিস'** বা **'অগস্টাস'**—যার অর্থ হল 'মহামহিম'। ইতিহাসে তিনি অক্টোভিয়ান অগস্টাস নামেই পরিচিত। ইংরেজি অষ্টম মাসের আগস্ট মাস নাম হলো তাঁরই নাম থেকে। তিনি দীর্ঘ ৪৪ বছর রাজত্ব চালান। তিনিই রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-পর্বের রোমের প্রথম সম্রাট।

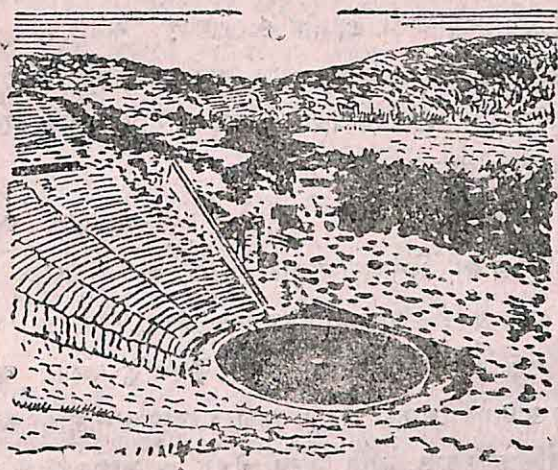


অক্টোভিয়ান বা অগস্টাস সীজার

অগস্টাসের যুগ রোমের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। এই পর্বে রোমের সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়। অগস্টাসের সময়ে রোমের ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস, মহাকাব্য ঈনিদ রচয়িতা ভার্জিল, গীতিকবি হোরেস, পৌরাণিক কাহিনী রচয়িতা ওভিড প্রভৃতি অনেকেই জন্মেছিলেন।

অক্টোভিয়ান শিল্প ও স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসন-কালে মার্বেল পাথরের তৈরি বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়।

সেগুলির মধ্যে কলোসিয়াম নামে প্রেক্ষাগৃহ উল্লেখযোগ্য। এখানে মানুষ ও পশুর লড়াই হত। এ্যাম্ফিথিয়েটার তাঁর পরবর্তীকালের



এ্যাম্ফিথিয়েটার

সম্রাটদের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এতে স্টেডিয়ামের মত বহু দর্শক-আসন ছিল। তাতে জন্তু-জানোয়ারের লড়াই হত। দর্শকেরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেটা উপভোগ করত।

অগস্টাসের পরবর্তী সম্রাটগণ : অগস্টাস সীজারের মৃত্যুর পর বিভিন্ন চরিত্রের খামখেয়ালী, আধপাগল ও নিষ্ঠুর সম্রাটেরা একের পর এক রোমের সিংহাসনে বসেন। এঁদের মধ্যে ক্যালিগুলা, নীরো, মার্কাস অরোলিয়াস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ক্যালিগুলা ছিলেন আধপাগল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সম্রাট। নীরো ছিলেন খেয়ালী ও অত্যাচারী সম্রাট। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে—রোমে একবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। তাতে চারদিক পুড়ে প্রায় শ্মশান হতে চলেছে। এমন বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দেখে নীরো নীরব থাকেন ও বীণা বাজনায় মত্ত হন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মার্কাস অরোলিয়াস ছিলেন একজন সুশাসক ও দার্শনিক। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলার জন্য তিনি দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম

করতেন। একটু অবসর পেলেই দার্শনিকতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতেন ও নিজের চিন্তাভাবনা লিখে রাখতেন। এমনি করে প্রায় দু'শ বছর চলে। রোমান সাম্রাজ্য যথারীতি বাড়তে থাকে। রোমে আগের মতই বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। বিজিত সাম্রাজ্য হতে ঐশ্বর্য ও সম্পদ এনে রোমান সম্রাটেরা রোম নগরীকে সাজিয়ে তোলেন। বাইরের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর সত্ত্বেও তলে তলে রোম ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে।

রোম সাম্রাজ্যের পতন: একে পর এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোমানদের সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দরকার ছিল উপযুক্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসকের। অগস্টাস সীজারের পর হতেই রোমবাসী সেটা উপলব্ধি করে। দুর্বল ও অপদার্থ সম্রাটদের শাসনদক্ষতার অভাবে রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়। রোমের অভিজাতেরাও নতুন নতুন ঐশ্বর্য ও সম্পদ পেয়ে যুদ্ধবিমুখ ও বিলাসী হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে গথ, ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল ইত্যাদি উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালায়। অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দেয়। সেটা দমন করার মত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ও দূরদশী রাষ্ট্রনায়ক রোমে ছিল না। সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদীই রোমানরা শত্রুর আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনি করে ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার:

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সূচনায় খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্যালেস্টাইনের জুডিয়াতে জন্মেছিলেন। তখন রোমে চলছিল অগস্টাস সীজারের শাসনকাল। সে সময়েই রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্যালেস্টাইন। যীশুখ্রীষ্টের বাবা ও মা ছিলেন ইহুদী। বাবার নাম যোসেফ ও মা মেরী। বাবা যোসেফ ছিলেন একজন সামান্য ছুতোর। তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদী সমাজে

পুরোহিতরা ছিলেন সর্বশক্তিমান। ধর্মের নামে তাঁরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ব্যাখ্যা দিতেন ও সমাজে তখন ভণ্ডামি চলত। ছোট বেলা হতেই যীশু খুব ভাবুক ছিলেন। তিনি বড় হয়ে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। ইহুদীদের ঘরে ঘরে, পাহাড়ে ও হ্রদের ধারে যীশু তাঁর ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় খ্রীষ্টান ধর্ম। তাঁর প্রধান উপদেশ ছিল—এই পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য। সকলে যদি হিংসা, লোভ ও স্বার্থপরতা ভুলে প্রেম ও মৈত্রী বাঁধনে আবদ্ধ হয়, তবেই স্বর্গরাজ্যের সূচনা হবে। যীশুখ্রীষ্টের জনপ্রিয়তা ও খ্রীষ্টানধর্মের ব্যাপক প্রচারে ইহুদী পুরোহিতেরা আতঙ্কিত হয়। তাঁরা যীশুর নামে অভিযোগ আনে। বিচারে যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রায় তিনশ বছর পরে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এমনি করে ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত হয়। এখনও রোমনগরী খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র তীর্থনগরী। রোমের ধর্মীয় প্রধান বা পোপ হলেন খ্রীষ্টান ধর্মজগতের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১। রোমানজাতি সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়ে পরিচিত কেন? রোমের উদ্ভব সম্পর্কে কি জান?

২। রোম-কার্থেজ সংঘর্ষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। হ্যানিবল কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান বলিতে কি বোঝ?

৫। রোমে ক্রীতদাস বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৬। কেমন করে রোমে সাধারণতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের নতুন করে প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল?

৭। জুলিয়াস সীজারের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।
৮। অগস্টাস সীজারের শাসনকাল সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। রোমে নাগরিক অধিকার কারা পেত ?
২। অগস্টাসের পরবর্তী রোমান সম্রাটদের সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের একটি বিবরণ দাও।
৪। কেমন করে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?
৫। কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টানধর্মের প্রচার হয় ?
৬। স্পার্টাকাস কে ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) কার নামে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হয় ? (খ) কার্থেজ কোন্ জাতির বাণিজ্য-নগরী ছিল ? (গ) হ্যামিলকার বার্কা কে ছিলেন ? (ঘ) সিনেট কি ? (ঙ) ট্যাসিটাস কে ছিলেন ? (চ) খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্ম-নগরী কি ? (ছ) ওভিড কে ? (জ) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক কে ? (ঝ) কোন্ রোমান সম্রাট প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ? (ঞ) নীরো কে ছিলেন ? (ট) ক্যালিগুলা কে ছিলেন ? (ঠ) কলোসিয়াম কি ? (ড) এ্যাম্ফিথিয়েটার কি ?

২। **ভুল থাকলে শুদ্ধ কর :** (ক) রোমানরা ফিনিশিয় জাতির এক শাখা। (খ) পিউনিক শব্দের ল্যাটিন অর্থ রোম। (গ) ব্রুটাস ছিলেন রোমান—একজন কার্থেজ-নায়ক। (ঘ) জুজিয়াস সীজার রোমের প্রথম সম্রাট।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) দ্বিতীয় — পর কার্থেজবাসীকে — হতে একেবারে পাতাতাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়। (খ) রোমের অভিজাত ব্যক্তিদের বলা হত —। (গ) আজ — হাজার বছর আগে — সীজার নামে একজন —

বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার সাধন করেন। (ঘ) অগস্টাসের যুগ — ইতিহাসে এক — যুগ। (ঙ) মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন একজন — ও —।

৪। **সঠিক উত্তরটি খুঁজে (✓) এইরূপ চিহ্নে চিহ্নিত করে দেখাও এবং শূন্যস্থানে বসাও ঃ—**

(ক) হ্যানিবল ছিলেন—	রোমান সম্রাট/গ্রীক সেনাপতি/ কার্থেজ সেনাপতি।
(খ) রোমে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে প্রথম সম্রাট হন—	অগস্টাস সীজার/ক্যালিগুলা/ নীরো।
(গ) রোমের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন—	ওভিড/ভার্জিল/ট্যাসিটাস।
(ঘ) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন—	স্পেনে/কার্থেজে/জুড়িয়াতে।
(ঙ) প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন রোমান সম্রাট—	নীরো/জাস্টিনিয়ান/ কনস্টান্টাইন।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদ	দুর্ভেদ্য চীন

ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা যখন দেশ-বিদেশে নতুন নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনে লিপ্ত হয়—ঠিক তেমনি সময় দুর্লঙ্ঘ্য চীন দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। ইতিহাসের উত্থান-পতন বা পরাক্রান্ত রাজার লেশমাত্র প্রভাব সেখানে পড়েনি।

মহান শাং-বংশের রাজত্বকাল ঃ চীনে প্রথমে ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সেগুলির মধ্যে সর্বদাই বিরোধ চলত। পরবর্তীকালে এই সব ছোট ছোট রাজ্যগুলি একই সম্রাটের অধীনে আসে। শাং, চৌ ইত্যাদি বংশের সম্রাটেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেশে শাসন চালায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাং-বংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। চীনের প্রথম সঠিক পরিচয় এই শাং-বংশের রাজাদের সময় থেকেই পাওয়া যায়। মাটির তলায় খনন কার্য চালিয়ে শাং-রাজাদের সময়কার বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে সব নিদর্শন দেখে অনুমান করা যায় যে, শাং-রাজাদের যুগে চৈনিক সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চীনা কবিতার উদ্ভব এই সময়েই হয়। চীনারা তখন চিত্রাঙ্কন-শিল্পে খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিল। কচ্ছপের খোলায় লেখা লিপি ও আঁকা ছবি, তীর ও বর্শা দ্বারা শূয়োর প্রভৃতি জন্তু শিকারের ছবি, মাটি ও এনামেলের পাত্র আর ব্রোঞ্জের বাসন ইত্যাদি নিদর্শন হতে প্রাচীন চীনাদের উন্নত সভ্যতার পরিচয় মেলে। প্রায় সাড়ে ছয় শ' বছর শাং-রাজারা চীনে রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব তখনও সেখানে লোহার ব্যবহার চালু হয়নি। শাং-রাজবংশ ইতিহাসে 'ঈন' রাজবংশ নামে পরিচিত। শাং-বংশের পরে এখানে চৌ-বংশীয়দের রাজত্ব চলে।

কনফুসিয়াস ঃ আমাদের ভারতবর্ষের বুদ্ধ-মহাবীরের মত শান্তি ও মানবপ্রেমের মহান আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন কনফুসিয়াস। চীনের লু রাজ্যে এক গরীব পরিবারে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে কনফুসিয়াস শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি লু রাজার অধীনে উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর ভাল লাগেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

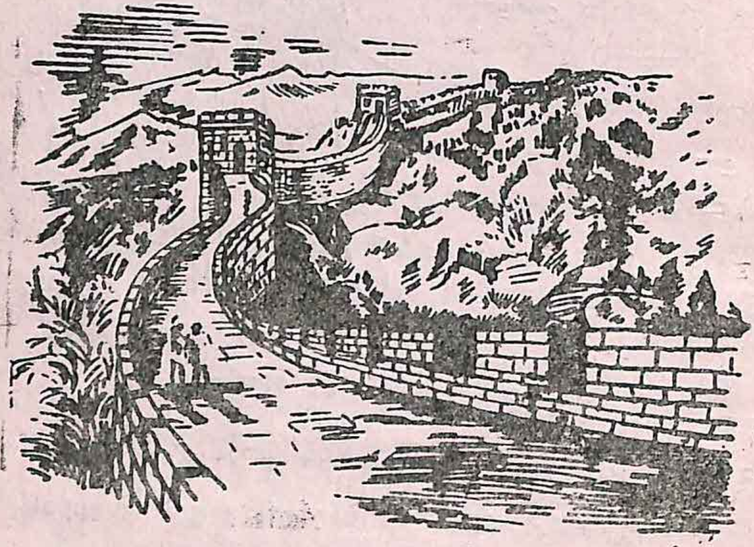


কনফুসিয়াস

বাণী ঃ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে কনফুসিয়াস উপলব্ধি করেছিলেন—আদর্শ-চরিত্র ও উন্নত জীবনগঠন ভিন্ন মানব জীবনের সার্থকতা ঘটে না। এর অভাবের জন্যই মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা। কোন্ কোন্ গুণ থাকলে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করতে পারে, সেটাই ছিল কনফুসিয়াসের প্রচারিত লোকধর্মের বিষয়বস্তু। ভগবান বা আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। তিনি দর্শনের কুটতর্কেও প্রবৃত্ত হন নি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে মানব-প্রেমিক কনফুসিয়াসের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি এই নতুন লোকধর্মের কথা বলে মানুষকে মুক্তির পথ দেখালেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের যদি কোন নাম দেওয়া যায়, তবে বলতে হয় সেটা—মানবধর্ব। ধর্মপ্রচারক পরিচয়ে কনফুসিয়াসের পরিচয় দিলে, তাঁর মহৎ অবদানকে ছোট করা হবে। বরং তাঁকে মানবধর্মের অমর সংস্কারক বলাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পরে চীনাবাসী তাঁর মতবাদের সত্যকার গুরুত্ব ও

তাৎপর্য উপলব্ধি করে। জীবিত অবস্থায় কনফুসিয়াস সে গৌরব ও মর্যাদা পাননি। কনফুসিয়াসের মত লাওৎ-সে ছিলেন আর একজন বিখ্যাত মানবপ্রেমিক মনীষী ও সমাজ-সংস্কারক।

চীনের প্রাচীর : পাহাড়-পর্বত-নদীঘেরা চীনদেশ অনতিক্রম্য ছিল। প্রাকৃতিক সৃষ্ট ব্যবধানকে চীনারা যথেষ্ট মনে করে নি। সভ্যজগতের বাইরে নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ওরা গড়ে তোলে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। **চীনের এই প্রাচীর আজও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্যরূপে গণ্য**। আজ হতে প্রায় ১২০০ বছর আগে চীন বংশীয় সম্রাট হোয়াং-তির আমলে এটি



চীনের প্রাচীর

নির্মিত হয়। দুর্দান্ত যাযাবর হুণদের আক্রমণ প্রতিরোধই ছিল এই প্রাচীর নির্মাণের উদ্দেশ্য। এটি চীনের রাজধানী পিকিং হতে বরাবর ২৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। পাথর আর মাটি দিয়ে এটি গঠিত ছিল। প্রাচীরের ওপরে মাঝে মাঝে ছিল সৌধ। সেই সৌধের দরজা বেয়েই নীচে নামবার রাস্তা। চীনা সৈন্যরা এই সব সৌধের ওপর থেকে কড়া নজর রাখত। বিদেশী শত্রুসৈন্য দেশের

অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করলে ওরা তীর ছুঁড়ে তাদের প্রতিরোধ করত।

চীনা সাম্রাজ্য ঃ দুর্লঙ্ঘ্য চীনে সহসা কোন বিদেশী শত্রু হানা দিতে পারত না। তাই সেখানে শাং, চউ, চীন ইত্যাদি বংশীয় সম্রাটেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সিংহাসনে আসীন ছিলেন। চৌ-বংশের পরে চীন-বংশীয় রাজা হোয়াং-তি প্রথম 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেন। চীন বংশের নাম অনুসারে এদেশের নাম হয় চীন। তখন থেকেই চীন একটি সাম্রাজ্যের গৌরব অর্জন করে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১। চীনের শাং-বংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান ?

২। কনফুসিয়াসের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer-Type Questions)

১। চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান লেখ।

২। চীনা সাম্রাজ্যের পরিচয় দাও।

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type)

১। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম কি ? (খ) কনফুসিয়াস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? (গ) চীনে কোন্ যাযাবর জাতির আক্রমণের আশঙ্কা ছিল ? (ঘ) চীনা কবিতার উদ্ভব কখন হয় ? (ঙ) চীনারা কখন চিত্রাঙ্কন-শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে ? (চ) শাং-রাজবংশকে ইতিহাসে কি বংশ বলে ? (ছ) কোন্ সম্রাটের শাসনকালে চীনের প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ? (জ) কনফুসিয়াস প্রচারিত ধর্মকে কি ধর্ম বলা যায় ? (ঝ) চীনের প্রাচীর কত কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল ? (ঞ) লাওৎ-সে কে ছিলেন ? (ট) চীনে প্রথম কে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) চীনের এই — আজও পৃথিবীর সপ্তম — অন্যতম — রূপে গণ্য। (খ) চীনের — রাজ্যে এক গরীব পরিবারে — জন্ম। (গ) প্রায় সাড়ে — শ' বছরব্যাপী — সম্রাটেরা রাজত্ব করেন। (ঘ) — পরে চীনবংশীয় রাজা — প্রথম — উপাধি গ্রহণ করেন।

৩। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ কর :

(ক) কনফুসিয়াস ছিলেন চীনের লু প্রদেশের রাজা। (খ) শাং-বংশীয়দের আমলে চীনের প্রাচীর নির্মাণ-কার্য শুরু হয়। (গ) লাওৎ-সে ছিলেন চীনবংশীয় সম্রাট।

———

পঞ্চম অধ্যায়
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহান ভারত

প্রাচীন ভারতবর্ষ মহৎ ও উদার। পৃথিবীর দেশ হতে দেশান্তরে যখন চলছিল যুদ্ধ, আর যুদ্ধ, সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দামতা— সে সময় ভারতের শান্ত তপোবনে আর্য ঋষিরা সর্বমানবের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছেন। বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী বিশ্ববাসীকে সেদিন পথ দেখিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের ধর্মবিজয়ের নীতি বিশ্ববন্দিত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত যুগে যুগে ভারততীর্থে বিলীন হয়ে গেছে। তাই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে **'মহামানবের মিলন-তীর্থ'**। ভারতের শান্ত তপোবন, নদ-নদী-পর্বত-ঘেরা রূপ সত্যই বিচিত্র। এর মনোরম শোভা এবং অতুলনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এদেশবাসীকে পরিণত করেছে কবি ও দার্শনিকে। যুদ্ধের উদ্দামতার পরিবর্তে এদেশবাসী চেয়েছে শান্তি ও মৈত্রী। গ্রীক এবং রোমান জাতিও আর্যসম্ভূত। ভারতবাসীও তাই। তবুও ওরা যখন নতুন নতুন রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য গড়েছে, ভারতবাসী তখন দেশ-বিদেশে শান্তির দূত পাঠিয়ে জানিয়েছে মৈত্রীর আহ্বান। এই মহান ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আমরা এখানে জানার চেষ্টা করব।

(১) **আর্যদের ভারতে আগমন ঃ** আর্য কোন জাতির নাম নয়, আসলে এটি একটি ভাষার নাম। সাধারণ ভাবে আর্য ভাষায় যারা কথা বলত, পরবর্তীকালে তারাই আর্য নামে পরিচিত হয়। প্রায় খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ অব্দে আর্যেরা ভারতে আসে। আর্যদের আদি-বাসস্থান ছিল মধ্য-এশিয়া কিংবা উত্তর-পূর্ব ইউরোপে। প্রথম তারা ছিল যাযাবর। এদের নানা শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মূল আর্য ভাষা শতধা বিভক্ত

হয়ে যায়। সেজন্তই সংস্কৃত আর গ্রীক ভাষায় মিল খোঁজা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

আর্যদের যে শাখা ভারতে এসেছিল, তারা উত্তর-পশ্চিম দিক হতে এদেশে প্রবেশ করে। প্রথমে পাঞ্জাব ও পরে সিন্ধুনদের তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্যরা ধীরে ধীরে বসতি গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে আর্য বসতি অর্থেই এসব অঞ্চলকে **আর্যাবর্ত** আখ্যা দেওয়া হয়।

(২) **বেদ**ঃ আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ ই **জ্ঞান**। এর চারিটি ভাগ— **ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব**। প্রতিটি বেদের আবার চারিটি অংশ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা ও উপনিষদ। ১৫০০-১২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে এই বেদগুলি রচিত। বেদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ঋক্‌বেদ। এতে ভারতে আসার পরবর্তীকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিচয় মেলে। বেদকে কেউ কেউ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষ নয়— দেবতার রচনা বলে থাকেন। তাদের মতে ভগবানের মুখ থেকে শোনা বাণীকেই নাকি আর্য ঋষিগণ বেদে প্রকাশ করেছেন। এরূপ বলার অর্থ— বেদের মানবিক মূল্যবোধকে ছোট করা। ঋষি শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানী পুরুষেরাই বেদ রচনা করেছেন। সেটা দেবতাদের মুখে শুনে লেখেন নি, লিখেছেন নিজেদের জ্ঞান, বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই।

বেদের রচনাকালীন সময়কালকে বলা হয় **বৈদিক যুগ**। বেদ রচনাকালীন পর্যায়কে বলা হয়—বৈদিক যুগ এবং পরবর্তী পর্যায় হল **বেদোত্তর যুগ**। আমরা আগে বৈদিক যুগের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

(৩) **আর্যদের সামাজিক ব্যবস্থা**ঃ আর্যরা প্রথমে গ্রামে কতকগুলি পরিবার মিলে বাস করত। গ্রামের প্রধানকে বলা হত **গ্রামণী**। কতকগুলি পরিবার মিলে গড়ে ওঠে গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর যিনি প্রধান, তাঁকে বলা হত গোষ্ঠীপতি বা রাজন। আর্যদের সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণ বিভাগ প্রথমে ছিল শ্রমভিত্তিক। এখানকার কৃষ্ণবর্ণ আদিম বাসিন্দাদের পরাজিত

করে আর্যরা তাদের দস্যু, অসুর ইত্যাদি আখ্যা দেয়। পরবর্তীকালে এরাই অনার্য রূপে পরিচিত হয়।

সমাজে পূজা ও ধর্মকর্ম করতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় চালাতেন রাজ্য-শাসন ও যুদ্ধকার্য, ব্যবসা চালাতেন বৈশ্য এবং এই উচ্চ তিন বর্ণের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব ছিল শূদ্রের ওপর। চারটি বর্ণবিভাগ ছিল প্রধানতঃ শ্রমভিত্তিক। তাই সেখানে জাতিভেদের কোনরূপ কড়াকড়ি ছিল না।

আর্যরা সুতী ও পশমের বস্ত্র পরত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল ফলমূল, গম ও যব জাতীয় খাদ্যশস্য। দুধ, ঘি, মাখন তাদের প্রিয় বস্তু ছিল। উৎসব-অনুষ্ঠান হলে তারা পশুর মাংস খেত ও সোমরস পান করত। রাজা ছিলেন নিরপেক্ষ ও ন্যায়-বিচারক। পুরোহিত ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া **'সভা ও সমিতি'** নামে দুটি সংগঠন ছিল। এদের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করে রাজা দেশ চালাতেন।

ধর্মীয় ব্যবস্থাঃ আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন-বিচিত্র প্রকাশকে পৃথক পৃথক দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। তবে এই সময়ে দেবীদের চেয়ে দেবতাদেরই প্রাধান্য ছিল। পুরোহিত ছিলেন ধর্মীয় প্রধান। আর্য দেব-দেবীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ইন্দ্র। তিনি ছিলেন ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা। অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে বরুণ ছিলেন জলের দেবতা, বায়ুর দেবতা মরুৎ, প্রত্যুষের দেবী ঊষা। আর্য ঋষিগণ নানা দেব-দেবীর কল্পনা করলেও তারা মনে করতেন—সেগুলি একই শক্তির বিচিত্র প্রকাশ। তারা আগুন জ্বেলে যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ছিল যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। যজ্ঞের পরে সোমরস পান করার বিধান ছিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। তারা নানা প্রকার শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। ছুতোর, চর্মকার, কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি শিল্পগোষ্ঠীদের উল্লেখ বেদে মেলে। আর্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল। বৈশ্যেরা ব্যবসা চালাতেন। ব্যবসা চলত বিনিময়ের মাধ্যমে। মানা ও নিষ্ক নামে

স্বর্ণখণ্ডের সাহায্যে তারা পরোক্ষ বিনিময় ও চালাতেন। আর্যরা মালপত্র পরিবহণের জন্য গরু বা মোষে টানা চক্রযান বা চার চাকার গাড়ী ব্যবহার করতেন। জলপথে নৌকাযোগে বহু দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

(৪) **মহাকাব্যের যুগঃ** খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০—৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বেদ রচনার শেষ ভাগে বাল্মীকির লেখা **রামায়ণ** ও ব্যাসদেবের লেখা **মহাভারত** রচিত হয়। গ্রীকদের ইলিয়াড-ওডিসির মত এই দুইটিও মহাকাব্য। এগুলিতে বেদের উত্তরকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকাব্যের রচনাকালীন সময় অর্থে এ-যুগকে বলে—মহাকাব্যের যুগ। অন্যদিকে বেদের উত্তরকালে বা পরবর্তীকালে মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। সেজন্য এ যুগকে বেদোত্তর যুগও বলা হয়।

রামায়ণঃ আর্য ও অনার্যের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ রচিত হয়। রামায়ণ হতে জানা যায়—বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণ হতে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল আর্যদের অধিকারে। আর্যগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বানর, রাক্ষস ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করেছেন। রামচন্দ্র সুদূর দক্ষিণ রাজ্যের সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান ইত্যাদি অনার্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলে, লঙ্কার রাজা রাবণকে পরাজিত করে, তাঁর অপহৃতা স্ত্রী সীতাদেবীকে উদ্ধার করেন। রাবণের ভাই বিভীষণ রামের পক্ষে থাকেন। পরে রাবণকে নিহত করে রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসান। আর্য ও অনার্য মিলে দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা ছড়িয়ে দেয়।

মহাভারতঃ মহাভারতের বিষয়বস্তু হল: পাণ্ডব ও কৌরব নামে দুই জ্ঞাতি রাজবংশের মধ্যকার যুদ্ধ ও তার পরিণাম। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে চলেছিল এদের মধ্যে মহাসংগ্রাম। যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডব সেনাপতি অর্জুনের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়ে-ছিলেন, তাই নিয়ে পরবর্তীকালে রচিত হয় 'ভগবদ্গীতা'। মহাভারতে বহু গল্পে সে-যুগের ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির

পরিচয় মেলে। এতে আর্যদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মহাকাব্যের যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনঃ মহাকাব্যের যুগে সমাজে পুরোহিতদের প্রাধান্য লোপ পায়। রাজারা সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। তাঁরা তখন 'সম্রাট', 'একরাট' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য তাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে একটা ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত। এই ঘোড়াকে কেউ বাধা দিলে বিরোধ দেখা দিত ও যুদ্ধ লাগত। যে রাজা বিজয়ী হয়ে নানা দেশ ঘুরিয়ে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারতেন—তিনি 'সম্রাট' উপাধি ধারণ করতেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তারই একটি কাহিনী তোমাদের উল্লেখ করছি। একবার সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর যজ্ঞের ঘোড়াকে দেবরাজ ইন্দ্র পাতালে মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। তারপর সগর রাজার ছেলেরা যজ্ঞের ঘোড়ার খোঁজে অনেক ঘুরে মুনির আশ্রমে এসে হাজির হন। সেই মুনি তো ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না। তিনি রেগে-মেগে সগর রাজার ছেলেদের অভিশাপ দেন। তারপরে ভগীরথ কেমন করে মুনিকে খুশি করে. দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে, মর্তে গঙ্গাকে বইয়ে দিয়েছিলেন—সে-সব কাহিনী তো তোমাদের সকলেরই জানা।

তখন যজ্ঞে পশুবলির বিধান ছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা তখন থেকেই বেড়ে যায়। সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন খুব সম্ভব এই সময় হতেই শুরু হয়। তখন কিন্তু রাজাদেরই শুধু ক্ষমতা বাড়েনি—পুরোহিতেরাও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। কারণ, যজ্ঞ করতে হলে রাজারা পুরোহিতদের ওপর সে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন। পুরোহিতেরা সেজন্য নিজেদের খেয়াল খুশিমত ধর্মীয় বিধান দিতে লাগলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রমশঃ আচারসর্বস্ব ও জটিল আকার নিতে

লাগল। এই অবস্থা সকলে মেনে নিতে পারলেন না। তাই অনেকেই মনে মনে এ অবস্থার বিরোধিতা করতে শুরু করলেন।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মের যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। তারই ফলে এই সময়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়।

জৈনধর্ম: জৈন শব্দের অর্থ—জয়ী। পার্থিব কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করেছেন, তিনিই জৈন। বৈদিক ধর্মের যাগ-যজ্ঞ ও



মহাবীর

পশুবলির বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই এই ধর্মের উদ্ভব। এই ধর্মের প্রচারকদের বলা হত তীর্থঙ্কর। প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ।

সম্ভবতঃ শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন **মহাবীর**। মহাবীর জৈনধর্মের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন।

মহাবীর ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-বিহারের বৈশালী নগরে এক রাজপরিবারে মহাবীরের জন্ম হয়। তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ করেন। বারো বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করার পরে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন ও জিতেন্দ্রিয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ী) হন। মহাবীর বলতেন, যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি অর্থহীন। অহিংসাই পরম ধর্ম। সকল জীবের প্রতি সমানভাবে দয়া দেখান উচিত। সত্য ধর্ম, সত্য জ্ঞান ও সত্য আচরণ—এই তিনটি ছিল তাঁর প্রধান উপদেশ। এগুলিকে জৈনেরা রত্নের মতই মূল্যবান মনে করে। সেজন্য এগুলিকে বলা হয় **'ত্রিরত্ন'**। মহাবীর সহজ-সরল ভাষায় উপদেশ দিতেন। সেজন্য সকলেই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারত। জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হ'ল অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মূলসূত্র। পরবর্তীকালে জৈনেরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর—এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়।

বৌদ্ধধর্ম ঃ গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমতকে বলা হয়—বৌদ্ধধর্ম। জৈনধর্মের অনুরূপ বৌদ্ধধর্মও হিন্দুধর্মের যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলির বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়।


বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব (আনুমানিক ৫৬৬-৪৮৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) ঃ বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধদেবের আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন একজন শাক্য-নায়ক। মানুষের জীবনে অন্তহীন দুঃখ—জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুর ভয়াবহতা বুদ্ধদেবের কোমল প্রাণে আঘাত দিত। তাই তিনি

মানবমুক্তির উপায় কিভাবে বের করা যায়—সে ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠেন। যৌবনে রাজকীয় ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সংসারের স্নেহ-মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি ঘরছাড়া হন। দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। অবশেষে তিনি মানবের মুক্তির পথের সন্ধান খুঁজে পান।

ধর্মমতঃ বুদ্ধদেব বলতেন—ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি—এ সব কিছুই বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। ধর্ম অন্তরের সম্পদ। সকল জীবের প্রতি দয়া এবং অহিংসাই পরম ধর্ম। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন কিংবা ভোগ-বিলাসের মাঝে ধর্ম নেই। সেজন্য দরকার মধ্যপন্থার অনুসরণ। সত্য আচরণ, সৎ স্মৃতি, সৎ জ্ঞান, সৎ জীবন, সৎ কর্ম, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্ ও সম্যক্ সমাধি—এই আটটি মার্গ বা উপায়কে বলা হয় **অষ্টাঙ্গিক মার্গ**। এগুলিকেই বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলে নির্দেশ করলেন। তাঁর মতে মানুষ বহু পাপের ফলে পৃথিবীতে জন্মায় ও অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। ক্রমাগত ভাল কাজ করে গেলেই মানুষ একদিন মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করবে। এই নির্বাণ-লাভকেই তিনি মানবজীবনের চরম সার্থকতা রূপে উল্লেখ করেন।

বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থের নাম **ত্রিপিটক**। এই ত্রিপিটককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ **সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক**। বৌদ্ধ-জাতকগুলিও বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়—**মহাযান ও হীনযান**। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম—এই দুই ধর্মেরই সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্মের বিরোধিতা থেকে। কিন্তু জৈনধর্মের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও অতিরিক্ত আত্মসংযমের আদর্শ সাধারণ গৃহীর পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যপন্থা সকলেরই পক্ষে অনুসরণযোগ্য। পরবর্তীকালে মৌর্য-সম্রাট অশোক, কুষাণ রাজা কণিষ্ক প্রভৃতি রাজাদের রাজানুগ্রহ লাভ করার ফলে বৌদ্ধধর্ম দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়।

এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সিংহল, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ লোক আজও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও

শান্তির বাণী যুগে যুগে বিশ্ববাসীর মনে নতুন অনুপ্রেরণা ও আদর্শবোধ জাগিয়ে তুলেছে। ভারত হতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকের দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করতে যেতেন। অন্যদিকে বিদেশ হতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাপকতরভাবে অধ্যয়ন করতে আসতেন। মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়ে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভ্রাতা) ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে চীনা বৌদ্ধ পর্যটক ফা-হিয়েন গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে ভারতে এসে বৌদ্ধ-ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজারা বৌদ্ধ বিহার ও মঠ নির্মাণ করতেন। সেগুলি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র। এইভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ও জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেন নবজীবন লাভ করেছিল।

(৬) **প্রাচীন রাজা ও রাজ্যঃ** মহাকাব্যের যুগ হতেই ভারতের খণ্ড-ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে অবিরত বিরোধ চলছিল। উত্তর ভারতে মগধ, অবন্তী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি অনেকগুলি ছোট-বড় রাজ্য ছিল। এসব রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বদা বিবাদ চলত। রাজারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য কখনও কখনও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। উত্তর ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল মগধ। এক সময়ে মগধ রাজ্যটি খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হর্যঙ্ক, শিশুনাগ ও নন্দবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। নন্দবংশীয় রাজাদের দুর্বলতা ও অপদার্থতাও প্রকাশ পায়। তারই সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন বীর, কৌটিল্য বা চাণক্য নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নন্দরাজারা ছিলেন অত্যাচারী। সারা দেশে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা নন্দরাজাদের অসাধ্য ছিল। তাই জনগণের অসন্তোষকে চন্দ্রগুপ্ত সদ্ব্যবহার করেন। নন্দবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ধনানন্দ। তিনি চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত : আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্যবংশ নামে পরিচিত। খুব সম্ভব চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরার নাম হতেই এই বংশের এইরূপ নামকরণ হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পিপ্পলীবনের একজন ক্ষত্রিয় নায়ক। এই পিপ্পলীবনের অধিবাসীরা ছিল মৌর্য। এরূপ শোনা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত যৌবনে কিছুকাল গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধশিবিরে থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী। তাঁর প্রধান অভিপ্রায় ছিল—নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করা। সেজন্য তিনি তলে তলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি গ্রীকদের রণকৌশল সম্বন্ধে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। সেটা দেখে আলেকজাণ্ডার মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। চন্দ্রগুপ্তের এরূপ ঔদ্ধত্যে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার বিরক্ত হলে, তিনি তাঁর শিবির হতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ শিবির হতে আসার পর চন্দ্রগুপ্ত একটি সুশিক্ষিত সৈন্যদল গঠন করেন। ঘটনাচক্রে এ সময়ে তিনি চাণক্য নামে একজন কূটনীতিক ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে আসেন। কথিত আছে, নন্দরাজা এই চাণক্যকে একদিন অপমান করেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য এঁরা দুজনে মিলে তখন যুক্তি-পরামর্শ করেন। একজনের সংকল্পের কথা আরেকজনকে জানান। তারপর তাঁদের যৌথ উদ্যোগের ফলে নন্দবংশের বিনাশ সাধন সম্ভব হয়।

চন্দ্রগুপ্ত একজন অসামান্য প্রতিভাধর রাজা, সাহসী রণনেতা ও সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। ভারত-আফগানিস্তান অঞ্চলের শাসনভার সেলুকাস নামে একজন সেনাপতির উপর ন্যস্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করে কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট অধিকার করেন। এরূপ কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ যুদ্ধহস্তী উপহার দেন। পরবর্তীকালে

সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন দূত প্রেরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে জানা যায়—চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার রথী এবং অসংখ্য হস্তী। খুব সম্ভব তাঁর একটা বিরাট নৌ-বাহিনীও ছিল। এই বিরাট নৌবাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ত্রিশজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্থা ছিল। এই সংস্থা আবার ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক-একটির ওপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভাব দেওয়া হয়। পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, রথীবাহিনী, হস্তীবাহিনী, নৌবাহিনী, সাধারণ পরিবহণ এবং খাদ্য ও সরবরাহের দায়িত্ব ছয়টি বিভাগ ও বোর্ডের সদস্যেরা দেখাশুনা করতেন। তাঁর শাসন-ব্যবস্থা উন্নত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে মগধকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র ও কাথিয়ার জয় করেন এবং মহীশূর পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তার করেন। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের টিলাতেলি জেলা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে পারস্যের সীমানা এবং পূর্ব সীমায় বাংলা ও মগধ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশাল সাম্রাজ্য যাতে সুশাসিত হয়, সেদিকে চন্দ্রগুপ্ত প্রখর নজর রাখতেন।

চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মহীশূরের শ্রাবণবেল-গোলায় বাস করতেন। তিনি জৈনধর্মের প্রথা অনুযায়ী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়।

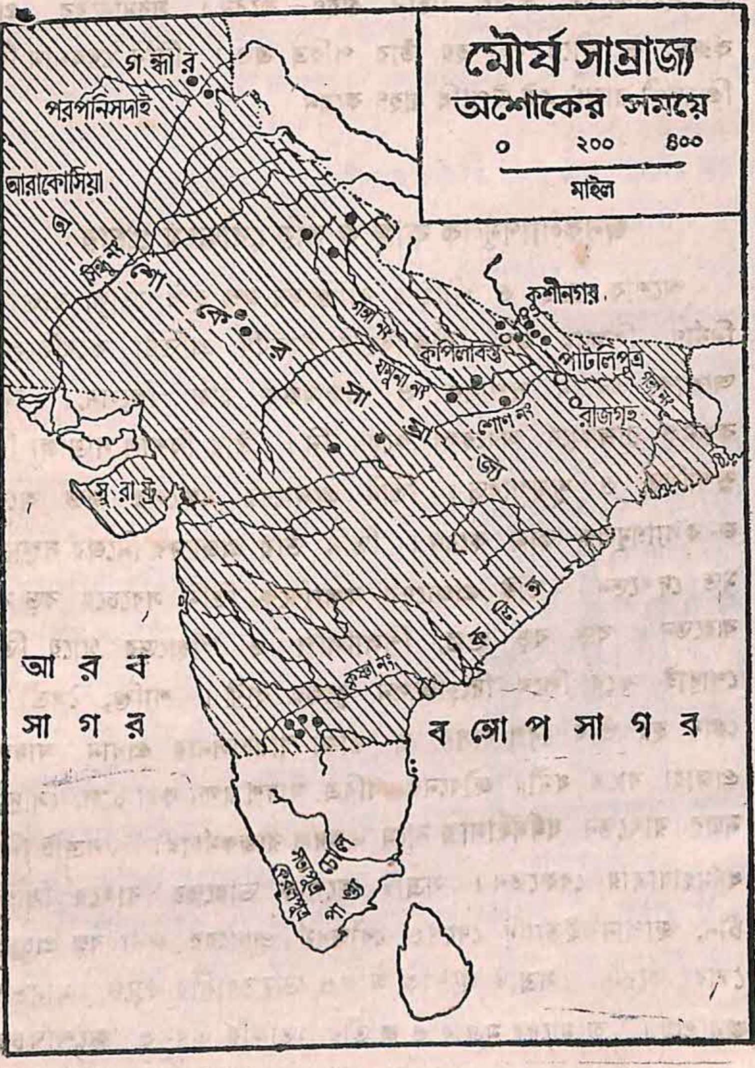
বিন্দুসার ঃ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর

শাসনকালে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজকুমার অশোক সেই বিদ্রোহ দমন করেন। বিন্দুসার সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন; সম্ভবতঃ ২৭৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক (আনুমানিক ২৭৩-১৭২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ): মহামতি অশোক প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। যুগান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও তিনি অমর। কথিত আছে, তিনি নাকি তাঁর পিতা এ ভাইদের হত্যা করে রক্তমাখা হাত নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সেজন্য তাঁকে বলা হত চণ্ডাশোক। সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন কলিঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্য। এই যুদ্ধে কলিঙ্গের এক লক্ষ সৈন্য নিহত হয়; দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়; আরও বহু লোক এই যুদ্ধের ফলে প্রাণ হারায়। কলিঙ্গ অশোকের রাজ্যভুক্ত হয়। এই যুদ্ধে বহু লোকের মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে চণ্ডাশোক অতিশয় অভিভূত হন। তাঁর মনে অনুশোচনা জাগে। তিনি এ সময়ে উপগুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। বোধহয় অশোক এ সময়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি হিংসার পথ বর্জন করেন ও অহিংসার পথ অনুসরণ করেন। এ সময়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানেরা যেন তাঁর ভয়ে ভীত না হন। তিনি তাঁর বংশধরদেরও যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের পথ পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। এমনি করেই প্রথম জীবনে



মহামতি অশোক


মৌর্য সাম্রাজ্য
অশোকের সময়ে
০ ২০০ ৪০০
মাইল
গন্ধার
পরপনিসদাই
আরাকোসিয়া
সিন্ধু নং
অ শো কে র সা ম্রা জ্য
গঙ্গা নং
যমুনা নং
কুশীনগর
কপিলাবস্তু
পাটলিপুত্র
শোণ নং
রাজগৃহ
সুরাষ্ট্র
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
সত্যপুত্র
কেরলপুত্র
চোল
পাণ্ড্য

কলিঙ্গ যুদ্ধের নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা চণ্ডাশোককে মহামতি অশোকে পরিণত করে। অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ জয় করে দিগ্বিজয়ী রাজা হবার সংকল্প তিনি ত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্মের ন্যায়, পবিত্র ও ধর্মবিজয়ের আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন। সর্বমানবের প্রতি করুণা ও জীবে দয়া হয় তাঁর পবিত্র ব্রত। তিনি 'দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' এই উপাধি গ্রহণ করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ ও তার বৌদ্ধধর্ম প্রচার

অশোক দুঃস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল, রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার জন্য বৌদ্ধ-বিহার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অশোক একজন সুশাসক ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তিনি কখনও রাজকার্যে অবহেলা করেন নি। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিল সুশাসিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের নিজের সন্তানের মত দেখতেন। তাই প্রজাদের কল্যাণকে তিনি সবচেয়ে বড় মনে করতেন। বড় বড় স্তম্ভ, শিলালিপি ও পাহাড়ের গায়ে তিনি খোদাই করে লিখে দিয়েছিলেন বুদ্ধের বাণী। শান্তি, মৈত্রী ও প্রেম হয় তাঁর দেশ-শাসন ও রাজ্য-পরিচালনার প্রধান আদর্শ। প্রজারা যাতে ধর্মীয় জীবনের পবিত্র আদর্শ রক্ষা করে চলে, সেদিকে নজর রাখতেন **ধর্মমহামাত্র** নামে একদল রাজকর্মচারী। সম্রাট নিজে ধর্মমহাযাত্রায় বেরুতেন। সম্রাট অশোক ভারতের বাইরে সিংহল, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বহু প্রচারক প্রেরণ করেন। সম্রাট অশোক আজও ভারতবাসীর কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। আমাদের মুদ্রায় ও জাতীয় পতাকায় এখনও **'অশোকচক্র'** শোভা পায়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী অবস্থাঃ অশোকের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মৌর্যবংশের পতন ঘটে।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলে এবং মহামতি অশোকের ধর্মবলে মৌর্য সাম্রাজ্য বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মগধকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর-ভারতে এই সময়ে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর শক, কুষাণ, ব্যাকট্রিক, গ্রীক ইত্যাদি যাযাবর জাতিগুলি ভারতবর্ষে অভিযান চালায়। ভারতের খণ্ড-ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অধিপতিরা তখন আভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত ছিলেন। এরই সুযোগে শক্তিশালী কুষাণেরা ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

কুষাণ: কুষাণেরা ছিল চীনের ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি-গোষ্ঠীর শাখা। এরা প্রথমে ব্যাকট্রিক গ্রীকদের পরাজিত করে তক্ষশীলা ও পেশোয়ার জয় করে। তারপর পাঞ্জাব উপত্যকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কুষাণেরা ভারত ও তাঁর নিকটবর্তী দেশগুলি নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। আনুমানিক প্রথম শতকে **প্রথম কদফাইসিস** বা **কুজুল কদফাইসিস** ভারতে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কণিষ্ক: কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কণিষ্ক। আনুমানিক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেকার বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে জলন্ধরে এক বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি বসে। তাঁর শাসনকালে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বাণিজ্য পারস্য ও মধ্য-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

কণিষ্কের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। পেশোয়ার, কাশ্মীর, মথুরা, শ্রাবস্তী, গোরক্ষপুর ও বারাণসী তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। সম্ভবতঃ

তিনি মগধও জয় করেন। সিন্ধুদেশ, মালব, রাজপুতনা ও কাথিওয়াড় তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। ভারতের বাইরে তিনি মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ জয় করেন। শেষ জীবনে কণিষ্ক সম্ভবতঃ চীন সম্রাট হো-টির সেনাপতি পানচাও-এর কাছে পরাজিত হন।

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক-ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণজাত গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়। মথুরায় ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে। এখানে কণিষ্কের একটি ভাঙা মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির নির্মাণকৌশল অতি অপূর্ব।

কণিষ্কের শাসনকালে সংস্কৃত সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র প্রভৃতি পণ্ডিত ও লেখকেরা কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক চরক ও শুশ্রুতের মত আরও অনেক জ্ঞানীগুণী লোক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। চিকিৎসাবিদ্যারও ব্যাপক চর্চা চলে। বৌদ্ধধর্ম এই সময় হতেই **হীনযান** ও **মহাযান** নামে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। চীন ও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁরই রাজত্বকালে কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে বৌদ্ধসন্ন্যাসী সুদূর চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও অন্য ধর্মের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধার ভাব মনে মনে পোষণ করতেন। কণিষ্কের শাসনকালে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ঘটে।

গুপ্ত রাজবংশ ঃ কুষাণ বংশের পতনের পরে আবার ভারতব্যাপী রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বিদেশী শত্রুদের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটে। দেশে রাজনৈতিক ঐক্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

গুপ্ত রাজারা প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন।

তাঁদের সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, সাহিত্য. জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ইত্যাদির বহুমুখী বিকাশ ঘটে। মহাকবি কালিদাসের মত কবি, আর্যভট্টের মত প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সমুদ্রগুপ্তের মত প্রবল পরাক্রান্ত দ্বিগ্বিজয়ী রাজা—এই যুগেই আবির্ভূত হন। সেজন্য এই যুগের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করেই ঐতিহাসিকেরা এই যুগকে আখ্যা দিয়েছেন—'স্বর্ণযুগ'।

গুপ্তবংশের উৎপত্তির ইতিহাস অস্পষ্ট। এ সময়কার উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'গুপ্ত'। তিনি 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি মগধ বা বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী এবং পুত্র 'ঘটোৎকচ'-ও 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ছিলেন ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র। তাঁর রাজস্বচক উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ'। তিনি নিঃসন্দেহে স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁর পরাক্রমে গুপ্তবংশের শক্তি ও মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি পায়। তিনি লিচ্ছবি বংশীয় 'রাজকন্যা' কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। তাতে তাঁর প্রভাব উত্তর-পূর্ব ভারতে সুদৃঢ় হয়। তিনি আনুমানিক ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোধ্যা, প্রয়াগ ও মগধ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর কিছুকাল পরে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ (৩৩০-৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে)- প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণবিজেতা, দিগ্বিজয়ী ও সমরকুশলী নরপতি ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। তিনি গুপ্তবংশেরও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ, দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ জয় করেন। আসাম, গাঙ্গেয় উপত্যকা, নেপাল এবং উত্তর ভারতের প্রায় নয়টি রাজ্যের রাজা, তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলেন। সুদূর

সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুমতি চেয়ে তাঁর কাছে একজন দূত পাঠান। কুষাণ ও শক রাজারাও তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখান।

সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতেরও বহু রাজ্য তিনি জয় করেন। একজন সম্রাটের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য ঠিকভাবে শাসন করা কঠিন ছিল। সেজন্য দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত সেখানকার বহু রাজাকে তাঁর করদ রাজ্যে পরিণত করেন। শকদের ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্ত রাজাদের পক্ষে দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভব হয় নি। সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ হরিষেণ কর্তৃক লিখিত একটি তাম্রশাসনে তাঁর দিগ্বিজয়ের ইতিহাস লেখা আছে।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের সময়কার একটি স্বর্ণমুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি পাওয়া গেছে। সেটা হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতেন ও 'কবিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজ্যবিজেতা, দিগ্বিজয়ী গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাঁর রাজ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুশাসক। তিনি তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য সুবন্দোবস্ত করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন। খুব সম্ভব তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। দুর্দান্ত প্রকৃতির শক নামক যাযাবরদের দমনের পর তাঁর উপাধি হয় 'শকারি'। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। শিল্প ও

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। সমুদ্রগুপ্ত অধিকৃত বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্য তাঁর রাজত্বকালেও অক্ষুণ্ন ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উদার ও সর্বধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। শঙ্কু, বরাহমিহির, আর্যভট্ট, কালিদাস প্রভৃতি সে যুগের নয়জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। এঁদের বলা হত 'নবরত্ন'। এই নবরত্নদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মহাকবি কালিদাস। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে কিংবদন্তীর কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন লৌকিক গল্পের 'বিক্রমাদিত্য'। তাঁর তাল ও বেতাল নামে দুজন অনুগত প্রেত ছিল। এদের দিয়ে তিনি অসাধ্য-সাধন করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ কাহিনীকে অবিশ্বাস্য, হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন। কারণ, ইতিহাসের বিষয়বস্তু কাল্পনিক কাহিনী নয়। সত্য ঘটনার বিবরণ দানই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। সেদিক হতে কিংবদন্তীর কাহিনীতে বর্ণিত তাল ও বেতালের রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অনৈতিহাসিক। তবে বোধহয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সাধারণ মানুষ কিংবদন্তীর কাহিনী শুনতে খুব ভালবাসত। সেজন্য রাজার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার কথা বলার জন্যই তাকে গল্পের নায়ক করে এরূপ কাহিনী গড়ে তুলেছিল।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের শক্তি, ঐক্য এবং সম্মান অক্ষুণ্ন রাখেন। তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে পুষ্যমিত্র নামে একটি উপজাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য


গুপ্ত সাম্রাজ্য
২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাশ্মীর
পাটলিপুত্র
উজ্জয়িনী
নর্মদা নঃ
তাপ্তী নঃ
গোদাবরী নঃ
বেঙ্গীপুর
পিষ্টপুর
কৃষ্ণা নঃ
তুঙ্গভদ্রা নঃ
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী নঃ
কায়ল
সিংহল
কামরূপ
ব্রহ্মপুত্র নদ
সমতট
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

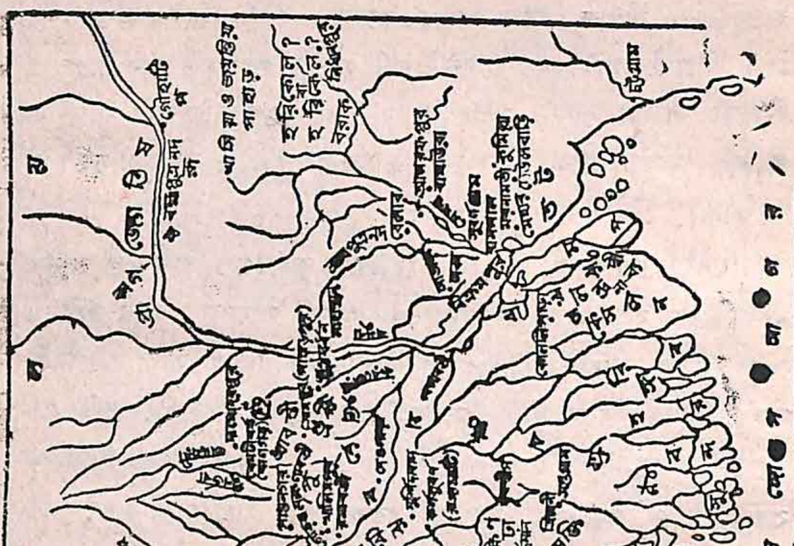
বিপদের সৃষ্টি করে। কিন্তু কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত সেই বিপদ হতে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। তিনি ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি দুর্ধর্ষ হূণদের পরাজিত করে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সুদৃঢ় শাসনে গুপ্তসাম্রাজ্যের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল ও অপদার্থ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি নরপতিগণ বহিশত্রুর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু নতুন রাজ্যজয় কিংবা রাজ্যশাসনের দিকে তাঁরা তত বেশী নজর দিতে পারেন নি। সেজন্যই গুপ্তসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে উঠে ও পতনোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়। গুপ্তরাজগণ নিজেদের বাহুবলে ও পরাক্রমে মগধকে কেন্দ্র করে একদিন যে রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা করেছিলেন, সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে ধীরে ধীরে তার পতন ঘটে।

(৭) প্রাচীন বাংলা: বাংলাদেশের ইতিহাস অতি প্রাচীন কিন্তু এই প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার মত নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব আছে। প্রথমতঃ, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের আগে বঙ্গদেশের প্রামাণ্য বা তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের তখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, যেমন—রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্রী, তাম্রলিপ্ত —আরও কত কি। বঙ্গদেশ বা বাংলা বলতে আমাদের মনে যে অখণ্ড ধারণা জাগে, —তার উৎপত্তি হয়েছে আরও অনেক পরে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীনতা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করা কঠিন। তবুও প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী লেখকদের বিবরণ হতে এদেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সন্ধান মেলে। আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে যে মনুষ্যবসতি ছিল, তার কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক-


বঙ্গদেশ
(প্রাচীন যুগ)
কিলোমিটার
প্রাচীন নাম -- কোটিবর্ষ
আধুনিক নাম : বাণগড়

নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় সেটার পরিমাণ খুবই সামান্য।

আর্যদের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন বেদ হল ঋক্‌বেদ। এর রচনাকাল আনুমানিক ১৫০০-১২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে। ঋক্‌বেদে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপেক্ষা করে বলা হয়েছে—বঙ্গ মগধের অধিবাসীরা খর্বাকার ও দূরাহারী। মহাভারত-এর রচনাকাল বেদের যুগের শেষ ভাগে—আনুমানিক নবম-দশক শতকে। তাতে বলা হয়েছে—বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। বিভিন্ন পুরাণেও বঙ্গ শব্দটির উল্লেখ মেলে। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীরের বাংলাদেশে রাঢ় অঞ্চলে পদার্পণের উল্লেখ মেলে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলাদেশে জাত নানা শিল্প ও কৃষিজাত জিনিসের খবরাখবর পাওয়া যায়। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়নের লেখায় সে যুগের গৌড়ের নাগরিকদের বিলাস-ব্যসনের কথা আছে।

বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী রাজা ও ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁরা এ-দেশ সম্বন্ধে নানা বিবরণী লেখেন। সে-সব বিবরণীর মধ্যে গ্রীক, রোমান ও চৈনিক লেখকদের বিবরণী উল্লেখযোগ্য। ভারত সম্পর্কে বিবরণ দিতে যাওয়ার সময়ে তারা প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় সম্ভবতঃ গঙ্গারিডির প্রাচীন রাজাদের ভয়েই তারা পূর্ব ভারতে অগ্রসর হতে বিরত হন। রোমানদের লেখাতেও গঙ্গারিডির উল্লেখ মেলে। এই অঞ্চল ছিল বাংলাদেশের অংশবিশেষ। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করেছেন। এই সব বিদেশী লেখকদের বিবরণী হতে বাংলাদেশের প্রাচীনতার বহু প্রমাণ মেলে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তরাজাদের সময়ে পুষ্করণা ও সমতট নামে রাজ্য ছিল। সমতটের রাজা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। এর পরে বাংলাদেশে গুপ্ত রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

(৭) **বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক :** ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এগুলির মধ্যে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বিদেশী পর্যটকদের ভারতবর্ষে পর্যটনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিবরণী উল্লেখযোগ্য উপাদান।

মধ্য এশিয়া : স্যার অরেলস্টাইন নামে প্রত্নতাত্ত্বিক মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত খননকার্য চালিয়ে সেখানে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। সে-সব নিদর্শন হতে অনুমান-করা যায় যে, এক সময় সেখানে ভারতীয় সভ্যতা বর্তমান ছিল। সেখানে বহু বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধস্তূপ, বুদ্ধের মূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কুষাণ সাম্রাজ্যের এক বৃহদংশ এই মধ্য-এশিয়ায় অবস্থিত ছিল এবং কুষাণ সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ। ফলে বৌদ্ধ-ধর্মপ্রচারকগণ এখানে ভারতীয় সভ্যতা স্থাপনের প্রচুর অবদান রেখে গেছেন। একসময় কাশগড় হতে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসানের প্রায় কয়েক শতাব্দী ব্যবধানে চীনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙও এখানে পরিদর্শনে এসে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরাজ করতে দেখেছিলেন।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী : গ্রীকরাজ সেলুকস কর্তৃক প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস ও চীনা বৌদ্ধ-পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণী আমরা আলোচনা করব। মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে। তখন এদেশে চলছিল মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল। আর ফা-হিয়েন ভারতে আসেন পঞ্চম শতকে গুপ্তরাজাদের শাসন-কালে। সাধারণভাবে বলা যায়, ঐ দুইজন পর্যটকদের বিবরণীতে, কেবলমাত্র সেই যুগেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখলে বলা চলে—কোন দেশের ঐতিহ্যই অতীতকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সেই দিক বিচার করলে বলা চলে—ঐ বিবরণগুলি প্রাচীন ভারতবাসীর জীবনধারারই পরিচয় বহন করে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিশাল বাহিনীর উল্লেখ আছে। সেই সৈন্যদল ছিল সুশৃঙ্খল। তিনি রাজধানী পাটলীপুত্রের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে দার্শনিক, শিল্পী, সৈনিক, গুপ্তচর, পশুপালক, শিকারী, কৃষক—এই সাতটি শ্রেণী লক্ষ্য করেন। এই শ্রেণী বিভাগ ছিল শ্রমভিত্তিক। অবশ্য প্রধান শ্রেণীবিভাগ ছিল চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজে জাতিভেদ ছিল না। ভারতবাসী তখন গ্রামে ও নগরে বাস করত। নগরের পৌরশাসন ছিল খুবই উন্নত। গ্রামে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। আইন ছিল কঠোর। মৌর্যরাজ প্রজাদের সঙ্গে খুবই ভাল বাবহার করতেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণী ঃ ফা-হিয়েন খুব সম্ভব ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি এদেশে প্রায় পনরো বৎসর অতিবাহিত করেন। তখন ভারতে চলছিল গুপ্তরাজাদের স্বর্ণযুগ। তাঁর বিবরণীতে মগধ রাজ্যের ঐশ্বর্যশালী রূপের উল্লেখ আছে। তিনি রাজধানী পাটলীপুত্রের শিল্প ও স্থাপত্য-নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হন। সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হত। বৌদ্ধমঠ ও বিহারগুলিতে চলত শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পাশাপাশি বাস করত। তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না। জনসাধারণ ছিল সৎ, আদর্শবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। তারা সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। দেশের আইন কঠোর ছিল না। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। রাজধানী পাটলীপুত্রে একটি সুন্দর হাসপাতাল ছিল। সেখানে রোগীরা বিনামূল্যে ঔষধ-পথ্য পেত। সেকালে ভারতবাসী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে পণ্যসামগ্রী বিদেশে প্রেরিত হত। বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা ছিল। কখনও কখনও তাদের অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত করা হত।

প্রাচীন ভারতের বহুমুখী সমৃদ্ধি

প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমানদের মত ভারতবাসীরাও ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক দিক থেকে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

ভাষা ও সাহিত্যঃ প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলি থেকেই এদেশীয় ভাষাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। আর্যেরা তাঁদের কথ্য ভাষায় বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। ক্রমে তা থেকেই সংস্কৃত ভাষা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। মৌর্যসম্রাট অশোক তাঁর ও গৌতম বুদ্ধের বাণী তৎকালীন সর্ববোধ্য ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে শিলা ও স্তম্ভগাত্রে খোদাই করিয়েছিলেন। ভারতীয় ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে ব্রাহ্মী-লিপির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসাধারণ। কারণ ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন লিপি ঐ ব্রাহ্মীলিপির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

তোমরা জানো, বেদই হল আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য। বেদের সংহিতা ও উপনিষদগুলিতে আর্য ঋষিদের অসামান্য কবিত্বশক্তি, সৌন্দর্যবোধ, দার্শনিকতা ও প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় মেলে। বেদোত্তর যুগের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' সর্বদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি মহাকাব্য। মৌর্য যুগের তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল—কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র' এবং বৌদ্ধগ্রন্থ 'কথাবত্থু'। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। সে সময়কার প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন অশ্বঘোষ ও বসুবন্ধু। অশ্বঘোষের রচিত গ্রন্থ হল 'বুদ্ধচরিত'। এ ছাড়া কুষাণ যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাহিত্যসৃষ্টি হল—'মিলিন্দপঞ্হো', দিব্য-বদান' ও 'ললিতবিস্তার'।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হল গুপ্তযুগ। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজেই কবিতা লিখতেন। তাই তিনি 'কবিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। এ যুগেই আবির্ভূত হন মহাকবি কালিদাস, শুদ্রক ও বিশাখা দত্তের মত প্রতিভাবান কবি। মহাকবি কালিদাস সর্বযুগের

সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত। প্রথম জীবনে নাকি মহাকবি কালিদাস ছিলেন একেবারে নিরেট মূর্খ। বিদুষী পত্নীর পদাঘাতের অপমান সইতে না পেরে জলে ডুবে মরবার সংকল্প নেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর দেন। সরস্বতীর বরে মূর্খ কালিদাস মহাকবি কালিদাসে পরিণত হন। এ কিংবদন্তী ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। কালিদাস অসামান্য প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। এরূপ প্রতিভা চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অসম্ভব। মহাকবি কালিদাসের লেখা 'মেঘদূত' চিরন্তন বিরহ-মধুর প্রণয় কাব্য। 'রঘুবংশে' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যের উল্লেখ মেলে। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে হর-পার্বতীর মিলন কাহিনী বর্ণিত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কালিদাসের লেখা একটি নাটক। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিরহ-মিলনের কাহিনী নিয়ে এটি রচিত। কালিদাসের সমকালীন আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি বিশাখ দত্ত। তাঁর 'মুদ্রারাক্ষস' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দদের মধ্যে মগধের সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধ কাহিনীকার বিষ্ণুশর্মা তাঁর 'পঞ্চতন্ত্রে'র কাহিনীগুলি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া গুপ্তযুগে অনেক পুরাণ ও স্মৃতির কাহিনী রচিত হয়েছিল।

শিল্প: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত শীলমোহর, মৃৎপাত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি নিদর্শন সে যুগের শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সিন্ধু সভ্যতার বিনাশের পর থেকে ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলার কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু মৌর্যযুগে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পীরা অসাধারণ নিপুণতা দেখিয়েছিলেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য দেখে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস বিস্মিত হন। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে নির্মিত স্তম্ভ, শিলালিপি, সারনাথের বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় মৌর্য যুগের স্থপতি ও ভাস্করেরা খুবই নিপুণ ছিলেন।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সময়ে গ্রীক-ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ-জাত গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়। এ সময়কার বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও চৈত্যগুলি তারই নিদর্শন। কণিষ্কের রাজধানী পেশোয়ার এবং তার সংলগ্ন পুরুষপুরে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, স্তূপ, বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি নিদর্শনগুলি কুষাণ যুগের অতুলনীয় শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। দেওগড়—এর মন্দির, অজন্তার গুহা চিত্র প্রভৃতি গুপ্তযুগের শিল্পীদের কৃতিত্ব ও দক্ষতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণেও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের অনুমান অজন্তা গুহা



অজন্তার গুহাচিত্র



অজন্তার গুহামুখ

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী নির্মিত হয়েছিল। এর অভ্যন্তর ভাগ ছিল প্রাচীর চিত্রের দ্বারা সুশোভিত। অজন্তা গুহার প্রবেশ মুখটি গুপ্ত যুগে আরো সুন্দর করে গঠন করা হয়। গুপ্ত যুগে অজন্তা গুহায় বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী ও হিন্দু পুরাণ অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রগুলি অপরূপ সুষমামণ্ডিত। গুপ্ত

যুগের শিল্পী ও কারিগরেরা ধাতব দ্রব্যের ওপর সুন্দরভাবে কাজ করতে পারতেন। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত। দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্বেও আজও এটির মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ আছে। তামা গালিয়ে দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণেও গুপ্তযুগের শিল্পীরা গভীর পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগতিঃ বৈদিক যুগে শিক্ষা-দীক্ষার খুবই অগ্রগতি ঘটেছিল। ছাত্রেরা গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাভাস করত। অধ্যয়নই ছিল তখন প্রধান তপস্যা। তখন আর্য নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিল। অশোকের সময়কার একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়—তখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। তক্ষশিলা (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাটনায়) ছিল প্রাচীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান দুটি কেন্দ্র। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্য এখানে আসতেন। পাণিনি ও কৌটিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছিল জগৎ জোড়া খ্যাতি। এখানে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। এটি ছিল আবাসিক। কয়েক হাজার পণ্ডিত ও শিক্ষার্থী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করতেন। সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এখানে বিদ্যা-শিক্ষা দানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাঃ প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় আর্য ঋষিদের কাছে বিজ্ঞান-চর্চা ছিল ধর্মের অঙ্গ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি সঠিকভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতির চর্চা হত। আর্য ঋষিরা দিনক্ষণের হিসাব-নিকাশ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন। এর জন্যই তাঁদের পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় নির্ধারণ করার দরকার হয়। এ ভাবেই জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়। গণিতবিদ্যাও তাদের অজানা ছিল না।

তাঁরা যজ্ঞের সময় যে বেদী নির্মাণ করতেন, সেটা থেকেই জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

গুপ্তযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্ট প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের আমলে ভারতীয়রা দশমিক-সংখ্যার আবিষ্কার করে। গণিতের ক্ষেত্রে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা, শূন্য সংখ্যার সাহায্যে সকল অঙ্ক কষা, দশমিক পদ্ধতি, ঘনমূল, বর্গমূল ইত্যাদি এই গুপ্ত যুগেরই অভিনব আবিষ্কার।

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ বৈদিক আর্যদের চিকিৎসাবিদ্যা এবং শারীর-বিদ্যা সম্পর্কে যে জ্ঞান ছিল, অথর্ববেদে তার উল্লেখ মেলে। চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধিক সমৃদ্ধি ঘটে কুষাণ রাজাদের আমলে। এ যুগেই আবির্ভূত হন চরক, শুশ্রুত ও জীবকের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। সে সময় থেকেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভারতীয়দের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী, দ্রব্যের গুণাগুণ, এক দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যের মিশ্রণ ইত্যাদি হতেই রসায়ন বিদ্যার বিকাশ দেখা দেয়। গুপ্ত রাজাদের আমলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আরও উন্নতি ঘটেছিল। এ সময়েই শল্য চিকিৎসা (surgery) ব্যাপক প্রসার ঘটে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)

১। আর্যদের ভারতে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে কি জান?

২। বেদ কি? বেদের যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

৩। মহাকাব্যের যুগ বলতে কি বোঝ? এ সময় সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটে?

৪। কখন জৈনধর্মের উদ্ভব হয়? মহাবীরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁর জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে কম কথায় লেখ।

৬। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৭। মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকাল কোন্ কোন্ কারণে উল্লেখযোগ্য।

৮। কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৯। গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

১০। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান?

১১। বাঙালীর ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১২ মধ্য-এশিয়ার প্রাপ্ত নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে কি কি জানা যায়? কিভাবে এটি আবিষ্কৃত হল?

১৩। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে মৌর্য যুগের কি পরিচয় পাও?

১৪। ফা-হিয়েনের বিবরণ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৫। 'প্রাচীন ভারতের বহুমুখী সমৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। ভারতের ইতিহাস মহান কেন?

২। আর্যদের ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও।

৩। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি?

৪। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৫। গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

৬। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে কি জান?

৭। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কবি কালিদাস কেন স্মরণীয় হয়ে আছেন?

বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective Type)

১। **মৌখিক প্রশ্ন:** (ক) বেদ শব্দের অর্থ কি? (খ) বেদোত্তর যুগ বলতে কি বোঝ? (গ) সেলুকাস কে? (ঘ) বিন্দুসার কে ছিলেন?

(ঙ) ধর্মমহামাত্র কাদের বলা হত ? (চ) পুরুষপুর উল্লেখযোগ্য কেন ? (ছ) মৌর্য সম্রাটদের রাজধানীর নাম কি ছিল ? (জ) তীর্থঙ্কর বলতে কি বোঝ ? (ঝ) মহাবীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? (ঞ) ভাগবদ্‌গীতা কি ? (ট) সবচেয়ে প্রাচীন বেদের নাম কি ? (ঠ) 'শকারি' কোন্ রাজার উপাধি ছিল ? (ড) 'কবিরাজ' উপাধি কোন্ রাজা গ্রহণ করেন ? (ঢ) কুষাণেরা কোন্ জাতিগোষ্ঠীর শাখা ? (ণ) মহাকবি কালিদাসের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম কর। (ত) চরক কে ? (থ) আর্যভট্ট কে ছিলেন ? (দ) বরাহমিহির কি আবিষ্কার করেন ? (ধ) চিকিৎসাবিদ্যার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ঘটেছিল কখন ? (ন) পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা কে ?

২। **ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ কর :**

(ক) ফা হিয়েন মৌর্য রাজাদের সময় এবং মেগাস্থিনিস গুপ্ত রাজাদের সময়ে ভারতে আসেন। (খ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন ? (গ) পুরুষপুর ছিল সমদ্রগুপ্তের রাজধানী। (ঘ) সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বেদ হল সামবেদ। (ঙ) বুদ্ধদেব বিহারের বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। (চ) গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। (ছ) বুদ্ধদেব কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ দেন। (জ) চণ্ডাশোক নন্দবংশ ধ্বংস করেন ? (ঝ) কৌটিল্য বা চাণক্য ছিলেন নন্দবংশের একজন রাজা। (ঞ) বসুবন্ধু ও অশ্বঘোষ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ কবি গুপ্তযুগে আবির্ভূত হন।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) আর্য কোন — নাম নয়, আসলে এটি একটি — নাম। (খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ —। (গ) বেদের রচনাকালীন সময়কে বলে — যুগ। (ঘ) আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল — ও —। পার্থিব কামনা-বাসনা ও — যিনি জয় করেছেন তিনি জৈন। (ঙ) বুদ্ধ শব্দের অর্থ —। বুদ্ধদেবের আসল নাম ছিল —। (চ) মহামতি — প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম — নরপতি। (ছ) অশোকের মৃত্যুর পরে — অভাবে — বংশের পতন ঘটে। কুষাণদের পতনের পরে আবার — অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

৪। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করে (√) চিহ্নে চিহ্নিত করে নির্দেশিত কর :

(ক) গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা? (প্রথম চন্দ্রগুপ্ত/সমুদ্রগুপ্ত/কুমারগুপ্ত)

(খ) পেশোয়ার কোন্ রাজার রাজধানী ছিল? (অশোক/কনিষ্ক/সমুদ্রগুপ্ত)

(গ) পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি কে নির্ণয় করেন? (আর্যভট্ট/কালিদাস/বরাহমিহির

(ঘ) মেগাস্থিনিস কোন্ রাজাদের সময়ে ভারতে আসেন? (গুপ্ত/মৌর্য/কুষাণ)

(ঙ) স্যার অরেলস্টাইন কে ছিলেন? (নৃতাত্ত্বিক/প্রত্নতাত্ত্বিক/ঐতিহাসিক)

(চ) শূদ্রক কে ছিলেন? (গুপ্তযুগের একজন কবি/নাট্যকার/লেখক)

কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩ লক্ষ অব্দ : পিকিংয়ের গুহামানবদের সময়কাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০০ অব্দ : পুরা প্রস্তর যুগ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৮০০০ অব্দ : নতুন প্রস্তর যুগ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪০০০ অব্দ : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪০০০ অব্দ : মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সূচনাকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ অব্দ : মিনিস কর্তৃক মিশরে রাজবংশের আরম্ভ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৪৫০-১৭৮৮ অব্দ : মিশরে নবম হতে অষ্টাদশ রাজবংশীয় ফারাওদের রাজত্বকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০ অব্দ : ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৭৮০-১৫৮০ অব্দ : মিশরে আর্য উপজাতি হিক্‌সসদের শাসন। অশ্বের ব্যবহার মিশরে প্রচলিত হল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৬০০ অব্দ : হিক্‌সসদের মিশর হতে বিতাড়ন ও উপনিবেশ বিস্তার।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪০০-১২০০ অব্দ : ফারাওদের সাম্রাজ্য, পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তার। লৌহ যুগের সূচনা।

আনিমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২৫০ অব্দ : ব্যাবিলনে রাজা হামুরাবি। পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত আইন-প্রণয়ন।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২০০ অব্দ : ইহুদীদের মিশর ত্যাগ। মোজেসের নেতৃত্বে আকাঙ্ক্ষিত দেশ ক্যানানের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ অব্দ : জেরুজালেমে ডেভিড ও সলোমনের রাজত্বকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৭৭৬ অব্দ : গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৭৫০ অব্দ : ইটালীতে রোম নগরের পত্তন।

আনুমানিক ৫৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব : সাইরাস কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন।

আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্ট-পূর্ব : কনফুসিয়াসের আবির্ভাবকাল।

আনুমানিক ৪৮০ খ্রীষ্ট-পূর্ব : পারসিকদের গ্রীস অভিযান। এথেন্স বিধ্বস্ত।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৪৮-৪৩০ অব্দ : এথেন্স পেরিক্লিসের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৯৯ অব্দ : সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৭৬ অব্দ : রোমে প্যাট্রিশিয়ান-প্লিবিয়ানদের বিবাদকাল।

আনুমানিক ৩৩৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব : ম্যাসিডন রাজা ফিলিপের মৃত্যু ও আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনারোহণ।

আনুমানিক ৩২৭-২৫ খ্রীষ্ট-পূর্ব : আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।

আনুমানিক ৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব : ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২১৩ অব্দ : চীনের হুয়াং-তিন শাসনকাল—চীনের প্রাচীর নির্মাণ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৬৪-২৪১ অব্দ : প্রথম পিউনিক যুদ্ধ : রোমের সঙ্গে কার্থেজের সংঘর্ষ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২১৮-২০২ অব্দ : দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। ইটালীতে-হ্যানিবল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৫ অব্দ : রোমে সীজারের শাসন, পঞ্জিকা সংস্কার।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৪ অব্দ : জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৩-৩১ অব্দ : জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। অকটোভিয়ান অগস্টাস রোমের সর্বময়কর্তা।

ভারত

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ অব্দ : সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ অব্দ : আর্যদের ভারতে আগমন। বৈদিক যুগ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৯৯-৫২৭ অব্দ : জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর মহাবীর।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৬৬-৪৮৬ অব্দ : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৪-৩০০ অব্দ : মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০-২৭৩ অব্দ : বিন্দুসারের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৭৩-২৩৬ অব্দ : মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৩০-৩৭৫ অব্দ : সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৮০-৪১৩ অব্দ : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৯৯-৪১৩ অব্দ : ফা-হিয়েনের ভারত পর্যটন।